ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৪র্থ পত্র: উসূলুল ইফতা ওয়াল ফিকহুল মুকারান

ক বিভাগ : উসুলুল ইফতা (রচনামূলক প্রশ্ন)

ফতোয়ার সংজ্ঞা ও ফতোয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি

প্রশ্ন-০১: পারিভাষিক অর্থে ফতোয়ার সংজ্ঞা দাও। ইসলামে এর বৈধতার (শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার) হিকমত কী? [ما عرف الفتوى اصطلاحا، وما الحكمة من مشروعيتها في الإسلام؟]

প্রশ্ন-০২: ফতোয়া ও বিচার (ক্বাযা)-এ মধ্যে পার্থক্য কী এবং এই পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট ফলাফল কী কী? [ما الفرق بين الفتوى والقضاء (الحكم)، وما هي الآثار المترتبة على هذا الفرق؟]

প্রশ্ন-০৩: 'ইলমুল ফতোয়া' কী? মুফতী যে সকল মূল উৎসের উপর নির্ভর করেন, তা কী কী? [ما هو "علم الفتوى"؟ وما هي أهم مصادره التي يعتمد عليها المفتي؟]

প্রশ্ন-০৪: 'রসমুল মুফতী'-এর সংজ্ঞা কী? কখন এটি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়? [ما هو تعريف "رسم المفتي"؟ ومتى نشأت الحاجة إلى تدوينه (كتابته)؟]

প্রশ্ন-০৫: ইসলামী সমাজ সেবায় ফতোয়ার তিনটি প্রধান শরয়ী উদ্দেশ্য উল্লেখ কর। [اذكر ثلاثة من أبرز المقاصد الشرعية للفتوى في خدمة المجتمع الإسلامي.]

প্রশ্ন-০৬: আধুনিক যুগে ফতোয়া ও ইজতেহাদের মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি স্পষ্ট কর। [وضح طبيعة العلاقة بين الفتوى والاجتهاد في العصر الحديث.]

প্রশ্ন-০৭: অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ফতোয়া প্রদানের বিধান বর্ণনা কর, এর অবৈধতার প্রমাণ উল্লেখ কর। [بين حكم الإفتاء لغير المؤهل، مع ذكر أدلة تحريم ذلك.]

প্রশ্ন-০৮: মুফতীর জন্য কি মুজতাহিদে মুতলাক্ব হওয়া শর্ত? এ বিষয়ে হানাফীদের অভিমত কী? [هل يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا مطلقا؟ وما هو رأي الحنفية في ذلك؟]

ফতোয়ার আদব ও শর্তাবলি

প্রশ্ন-০৯: মতভেদপূর্ণ মাসায়েলসমূহে অগ্রাধিকার প্রদানের সময় মুফতীর জন্য আবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলো কী কী? [ما هي أهم القواعد التي يجب على المفتي الالتزام بها عند الترجيح في المسائل الخلافية؟]

প্রশ্ন-১০: এই মূলনীতিটি ব্যাখ্যা কর : মুফতী হলেন সংবাদাতা, আর ফকীহ হলেন বিধানদাতা (শরীয়ত প্রণয়নকারী)-এর উদ্দেশ্যমূলক অর্থ বর্ণনা কর। [اشرح القاعدة "المفتي مخبر والفقيه مشرع" مع بيان المعنى المقصود.]

প্রশ্ন-১১: প্রশ্নকারীকে বরণ করা ও তার প্রশ্নের উত্তর প্রদানের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ 'আদাবুল ফতোয়া' উল্লেখ কর। [اذكر أهم "آداب الفتوى" المتعلقة باستقبال المستفتي والإجابة عن سؤاله.]

প্রশ্ন-১২: প্রশ্নের (ইস্তিফতা)-এর মধ্যে কী কী শর্ত থাকতে হবে যাতে তা উত্তর দেওয়ার উপযোগী হয়? [ما هي الشروط التي يجب توفيرها في السؤال (الاستفتاء) حتى يكون صالحا للإجابة؟]

প্রশ্ন-১৩: মুফতীর ব্যক্তিগত 'আদাবুল মুফতী' এবং ফতোয়া লেখার সাথে সম্পর্কিত 'আদাবুল ফতোয়া'-এর মধ্যে পার্থক্য কী? [ما الفرق بين "آداب المفتي" المتعلقة بشخصه و"آداب الفتوى" المتعلقة بكتابة الفتوى؟]

প্রশ্ন-১৪: ফকীহগণ কর্তৃক উল্লিখিত ফতোয়ার শর্তাবলি-এর মধ্যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত গণনা কর। [عدد خمسة من أهم "شرائط الفتوى" التي ذكرها الفقهاء.]

প্রশ্ন-১৫: যামানা ও স্থানের পরিবর্তন (প্রথার পরিবর্তন) কীভাবে ফতোয়ার শর্তাবলির উপর প্রভাব ফেলে? [كيف يؤثر تغير الزمان والمكان (تغير الأعراف) على شروط الفتوى؟]

প্রশ্ন-১৬: 'আহলিইয়াতুল ফতোয়া' কী? এটি অর্জিত, নাকি আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা? প্রমাণসহ স্পষ্ট কর। [ما هي "أهلية الفتوى"؟ وهل هي مكتسبة أم موهبة إلهية؟ وضح مع الدليل.]

প্রশ্ন-১৭: মুফতীর মধ্যে থাকা আবশ্যক এমন পাঁচটি মৌলিক নৈতিক গুণাবলি উল্লেখ কর। [اذكر خمسة من الصفات الأخلاقية الأساسية التي يجب أن يتحلى بها المفتي.]

প্রশ্ন-১৮: ফতোয়ার ক্ষেত্রে অবকাশ অন্বেষণ করা (তাতাব্বু রোখাস) (তাতাব্বু)-এর বিধান কী? মুফতীর জন্য কি তা শরীয়তভাবে বৈধ? [ما حكم تتبع الرخص (الترخص) في الفتوى، وهل يجوز للمفتي ذلك على الإطلاق؟]

প্রশ্ন-১৯: যে সকল মাসআলায় মাযহাবগুলোর মধ্যে তীব্র মতভেদ থাকে, মুফতী সেগুলো কীভাবে সমাধান করবেন? [كيف يتعامل المفتي مع القضايا التي تشتد فيها الخلافات بين المذاهب؟]

প্রশ্ন-২০: কোন নিয়মনীতিগুলো মুফতীকে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোরতা বা অতিরিক্ত শিথিলতা থেকে বাধা দেয়? [ما هي الضوابط التي تمنع المفتي من التشدد أو التساهل المفرط في الإفتاء؟]

মুজতাহিদদের স্তর ও হানাফী ফকীহগণ

প্রশ্ন-২১: হানাফীদের নিকট 'মুজতাহিদগণের স্তরসমূহ' বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর এবং প্রতিটি স্তরের প্রধান উদাহরণ দাও। [اذكر "طبقات المجتهدين" عند الحنفية بالتفصيل مع ذكر أبرز مثال لكل طبقة.]

প্রশ্ন-২২: হানাফী পরিভাষায় 'মুজতাহিদুল মাযহাব' ও 'মুজতাহিদুল মাসায়েল'-এর মধ্যে পার্থক্য কী? [ما الفرق بين "مجتهد المذهب" و"مجتهد المسائل" في الاصطلاح الحنفي؟]

প্রশ্ন-২৩: মুজতাহিদুল মাযহাব স্তরের উক্তিগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কীভাবে নির্ভরযোগ্য উক্তিটি নির্ধারণ করা হয়? [كيف يتم تحديد القول المعتمد عند تعارض الأقوال في طبقة مجتهدي المذهب؟]

প্রশ্ন-২৪: হানাফী মাসয়ালাসমূহের তিনটি মৌলিক স্তর কী কী? এগুলো সংক্ষেপে স্পষ্ট কর। [ما هي "طبقات مسائل الأحناف" الثلاثة الأساسية؟ وضحها بإيجاز.]

প্রশ্ন-২৫: 'যাহিরুর রিওয়ায়া'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এ মাসয়ালাগুলো সংকলনকারী প্রধান কিতাবসমূহ কী কী? [عرف "ظاهر الرواية" وما هي أهم الكتب التي جمعت هذه المسائل؟]

প্রশ্ন-২৬: 'মাসায়িলুন নাওযাদের' কী? সরাসরি এ মাসায়েল অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া কি সঠিক? [ما هي "مسائل النوادر"؟ وهل يصح الإفتاء بها مباشرة؟]

প্রশ্ন-২৭: 'মাসায়িলুল ওয়াকিয়াত' দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ লেখকগণ কারা? [ما المراد بـ"مسائل الواقعات"؟ ومن هم أشهر المؤلفين فيها؟]

প্রশ্ন-২৮: হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য উক্তি ও দুর্বল উক্তির মধ্যে কীভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়? [كيف يتم التمييز بين القول المعتمد والقول الضعيف في المذهب الحنفي؟]

প্রশ্ন-২৯: হানাফীদের নিকট 'মুজতাহিদুল ফতোয়া' স্তরের চারজন প্রধান ইমামের নাম উল্লেখ কর। [اذكر أربعة من أبرز الأئمة في طبقة مجتهدي الفتوى عند الحنفية.]

প্রশ্ন-৩০: হানাফী মাযহাবের বিধি-বিধানের অগ্রাধিকার ও মতপার্থক্যের উপর ফকীহগণের স্তরসমূহের প্রভাব আলোচনা কর। [ناقش أثر طبقات الفقهاء على ترجيح واختلاف الأحكام في المذهب الحنفي.]

নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ

প্রশ্ন-৩১: হানাফীদের নিকট 'নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ'-এর বৈশিষ্ট্য কী কী, যা সেগুলোকে অন্যদের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়? [ما هي خصائص "الكتب المعتمدة" عند الحنفية التي تجعلها مقدمة على غيرها؟]

প্রশ্ন-৩২: লেখকের নাম সহ হানাফী মাযহাবের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরযোগ্য কিতাবের নাম উল্লেখ কর। [اذكر خمسة من أهم الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي، مع ذكر مؤلفيها.]

প্রশ্ন-৩৩: 'আল-মারগীনানী কৃত হিদায়া কিতাবটি কেন ফতোয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরযোগ্য কিতাব হিসেবে বিবেচিত? [لماذا يعتبر كتاب "الهداية" للمرغيناني من أهم الكتب المعتمدة في الإفتاء؟]

প্রশ্ন-৩৪: অ-নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের প্রকারভেদ কী কী? প্রমাণ ছাড়া সেগুলোতে যা এসেছে, তদনুযায়ী ফতোয়া দেওয়ার বিধান কী? [ما هي أنواع "الكتب غير المعتمدة"؟ وما حكم الإفتاء بما ورد فيها دون دليل؟]

প্রশ্ন-৩৫: বিরোধ দেখা দিলে হানাফী পরিভাষা "আল-আসাহ" এবং "আর-রাজীহ"-এর তাৎপর্য স্পষ্ট কর। [وضح دلالة المصطلح الحنفي "الأصح" و"الراجح" عند التعارض.]

প্রশ্ন-৩৬: হানাফী পরিভাষায় 'মতন', 'শরাহ' ও 'হাশিয়া'-এর অর্থ কী এবং এগুলোর গুরুত্ব কী? [ما معنى "المتن" و"الشرح" و"الحاشية" في الاصطلاح الحنفي، وما أهمية كل منها؟]

প্রশ্ন-৩৭: হানাফী ফিকহের কিতাবসমূহে 'আশ-শাইখান' ও 'আত-ত্বারফান' দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য কী? [ما هو مرادهم بـ "الشيخان" و"الطرفان" في كتب الفقه الحنفي؟]

প্রশ্ন-৩৮: যে উক্তি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দিকে সম্পর্কিত, কিন্তু দুর্বল বর্ণনার মাধ্যমে এসেছে, তার সাথে কীভাবে আচরণ করা হয়? [كيف يتم التعامل مع القول المنسوب لأبي حنيفة ولكن برواية ضعيفة؟]

প্রশ্ন-৩৯: তাদের উক্তি: ফুলান বলেছেন- (قال فلان) (রাবী আন ফালান থেকে বর্ণিত হয়েছে)-এর অর্থ কী? তারজীহ (অগ্রাধিকার)-এ এর তাৎপর্য কী? [ما معنى قولهم: "قال فلان" أو "روي عن فلان"؟ وما دلالته في الترجيح؟]

প্রশ্ন-৪০: হানাফীদের এমন চারটি পরিভাষা উল্লেখ কর যা উক্তির শক্তি ও তদনুযায়ী আমল করার ইঙ্গিত দেয়। [اذكر أربعة من "مصطلحات الحنفية" التي تفيد قوة القول والعمل به.]

তারজীহের মূলনীতি

প্রশ্ন-৪১: বিভিন্ন বর্ণনার ক্ষেত্রে হানাফী মুফতী যে মৌলিক 'তারজীহের মূলনীতি'-এর উপর নির্ভর করেন, তা কী কী? [ما هي "قواعد الترجيح" الأساسية التي يعتمد عليها المفتي الحنفي عند اختلاف الروايات؟]

প্রশ্ন-৪২: এ মূলনীতিটি স্পষ্ট কর : যদি যাহিরুর রিওয়ায়া-এর বর্ণনাগুলো সাংঘর্ষিক হয়, তবে ইমাম (আবু হানীফা)-এর উক্তি গ্রহণ করা অগ্রাধিকারযোগ্য। [وضح القاعدة: "إذا تعارضت روايات ظاهر الرواية فالأخذ بقول الإمام أولى".]

প্রশ্ন-৪৩: 'আলাইহিল ফতোয়া' (এ মতের উপর ফতোয়া)-এর পরিভাষাগত তাৎপর্য কী? 'আল-মুখতার লিল-ইফতা' ও এর মাঝে পার্থক্য কী? [ما دلالة مصطلح "عليه الفتوى"؟ وما الفرق بينه وبين "المختار للإفتاء"؟]

প্রশ্ন-৪৪: হানাফী মাযহাবে মাসআলায় শুদ্ধতা প্রমাণ ও নির্ভরতা নির্দেশকারী তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা উল্লেখ কর। [اذكر ثلاثة من أهم المصطلحات التي تفيد تصحيح المسألة واعتمادها في المذهب الحنفي.]

প্রশ্ন-৪৫: উসূলবিদদের নিকট 'মফহুম মুখালাফ'-এর অর্থ ও শর্তাবলী আলোচনা কর। হানাফীগণ কি এটিকে দলীল হিসেবে বিবেচনা করেন? [ناقش مفهوم "مفهوم المخالفة" عند الأصوليين، وهل يعتد به الحنفية كدليل؟]

প্রশ্ন-৪৬: "মফহুমুল মুখালাফা সাধারণ মানুষের বোঝার ক্ষেত্রে ধর্তব্য, তবে শরীয়তের বক্তব্যসমূহে ধর্তব্য নয়" - এ মূলনীতিটি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়? [كيف يتم تطبيق قاعدة "مفهوم المخالف معتبر في مفاهيم الناس، لا في خطابات الشارع"؟]

প্রশ্ন-৪৭: (প্রথা ও রীতির স্বীকৃতি) এ মূলনীতিটি কী? উরূফ অনুযায়ী আমল করার শর্তাবলি কী কী? [ما هي "قاعدة اعتبار العرف والعادة"؟ وما هي شروط العمل بالعرف؟]

প্রশ্ন-৪৮: প্রথা পরিবর্তনের কারণে ফিকহী বিধান পরিবর্তিত হয়েছে এমন তিনটি উদাহরণ উল্লেখ কর। [اذكر ثلاثة من الأمثلة التي تغير فيها الحكم الفقهي بسبب تغير العرف.]

প্রশ্ন-৪৯: 'আদাবু কিতাবাতিল ফতোয়া' (ফতোয়া লেখার শিষ্টাচার) কী? কীভাবে ফতোয়ার বিন্যাস স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হবে? [ما هي "آداب كتابة الفتوى"؟ وكيف تكون صياغة الفتوى واضحة ومختصرة؟]

প্রশ্ন-৫০: ফতোয়া লেখার সময় মুফতীর জন্য বর্জনীয় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ কর। [اذكر ثلاثة من أهم الأمور التي يجب على المفتي تجنبها عند كتابة الفتوى.]

মুফতীর আদবসমূহ

প্রশ্ন-৫১: নতুন সৃষ্ট মাসায়েল (নাওয়াবিল) যেগুলো ফকীহগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি, সেগুলোতে ফতোয়া দেওয়ার বিধান কী? [ما حكم الإفتاء في القضايا المستجدة (النوازل) التي لم ينص عليها الفقهاء صراحة؟]

প্রশ্ন-৫২: মাযহাবের বহুত্বের সাথে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সাধনে মুফতীর ভূমিকা কী? [ما هو دور المفتي في تحقيق الوحدة بين الأمة الإسلامية مع تعدد المذاهب؟]

প্রশ্ন-৫৩: যে ফতোয়ার ফলে সমাজে অকল্যাণ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, মুফতী তা কীভাবে সমাধান করবেন? [كيف يتعامل المفتي مع الفتوى التي يترتب عليها مفسدة أو فوضى في المجتمع؟]

প্রশ্ন-৫৪: ফতোয়া প্রদান ও বিধি-বিধান পরিবর্তনে 'জরুরত' (অপরিহার্যতা) ও 'হাজত' (প্রয়োজন)-এর প্রভাব আলোচনা কর। [ناقش أثر "الضرورة" و"الحاجة" على إصدار الفتوى وتغيير الأحكام.]

প্রশ্ন-৫৫: মুফতীর কাজের প্রেক্ষাপটে 'আল-মাসআলা আল-ফিকহিয়্যাহ' (ফিকহী মাসআলা) এবং 'আল-ওয়াকিয়া' (ঘটিত ঘটনা)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? [ما الفرق بين "المسألة الفقهية" و"الواقعة" في سياق عمل المفتي؟]

প্রশ্ন-৫৬: হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য উসূল (নীতি)-এর উপর বিধি-বিধান কীভাবে বের করা হয় (তাখরীজ করা হয়)? [كيف يتم تخريج الأحكام على الأصول المعتمدة في المذهب الحنفي؟]

প্রশ্ন-৫৭: ফতোয়া প্রদানে 'আল-ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ' (ফিকহী মূলনীতিসমূহ)-এর গুরুত্ব সম্পর্কে মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান-এর অভিমত উল্লেখ কর। [اذكر رأي المفتي السيد محمد عميم الإحسان في أهمية "القواعد الفقهية" في الإفتاء.]

প্রশ্ন-৫৮: সাধারণ মানুষের প্রশ্ন (ইস্তিফাতুল আম্মাহ)-এর জন্য শরয়ী নীতিমালা কী? [ما هي الضوابط الشرعية لـ"استفتاء العامة".]

প্রশ্ন-৫৯: মুফতী কর্তৃক হাদীসের পরিভাষা জানার ক্ষেত্রে মুজাদ্দিদী (মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান)-এর 'মীযানুল আখবার'-এর গুরুত্ব স্পষ্ট কর। [وضح أهمية "ميزان الأخبار" للمجددي في معرفة المصطلحات الحديثية للمفتي.]

প্রশ্ন-৬০: সমকালীন মুফতী কীভাবে শরীয়তের মূলনীতির (নস) আনুগত্য এবং বাস্তবতার প্রতি যত্নশীলতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন? [كيف يمكن للمفتي المعاصر أن يجمع بين الالتزام بالنصوص وبين مراعاة الواقع؟]

ফতোয়ার সংজ্ঞা ও ফতোয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি

প্রশ্ন-০১: পারিভাষিক অর্থে ফতোয়ার সংজ্ঞা দাও। ইসলামে এর বৈধতার (শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার) হিকমত কী?

(عرف الفتوى اصطلاحا، وما الحكمة من مشروعيتها في الإسلام؟)

ভূমিকা (مقدمة): মানবজীবনের উদ্ভূত বিবিধ সমস্যার শরয়ী সমাধান জানার নামই ফতোয়া। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় ফতোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি এমন একটি মহান দায়িত্ব, যার মাধ্যমে মুফতি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দার কাছে দ্বীনের হুকুম পৌঁছে দেন। ফতোয়া প্রদানের এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য গভীর পাণ্ডিত্য ও বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন।

ফতোয়ার সংজ্ঞা (تعريف الفتوى): ১. আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): 'ফতোয়া' (الفتوى) শব্দটি আরবি। এটি 'ফাতা' (فتى) মূলধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ যুবক বা শক্তিশালী হওয়া। আভিধানিকভাবে ফতোয়া অর্থ হলো— কোনো জটিল বিষয় স্পষ্ট করা, নতুন ঘটনার বিধান বর্ণনা করা বা কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করা। আল্লামা ইবনে মানযুর (রহ.) বলেন: 'ফতোয়া' অর্থ হলো প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফকিহ ও উসূলবিদগণের মতে ফতোয়ার একাধিক সংজ্ঞা রয়েছে। হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা হলো:

"শরয়ী দলিলাদির আলোকে প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসিত কোনো উদ্ভূত সমস্যার বিধান বা হুকুম স্পষ্ট করাকে ফতোয়া বলে।"

আল্লামা ইবনে হামদান (রহ.) তাঁর 'সিফাতুল ফাতওয়া' গ্রন্থে বলেন: " **الفتوى هي الإخبار بحكم الله تعالى في النازلة عن دليل شرعي.**" (অর্থ: শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে কোনো নতুন ঘটনায় আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে সংবাদ দেওয়াই হলো ফতোয়া।)

ইসলামে ফতোয়ার বৈধতা (مشروعية الفتوى): ফতোয়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: *"তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।"* (সূরা নাহল: ৪৩) রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের বিভিন্ন সময় ফতোয়া দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। বিশেষ করে

মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় ইজতেহাদ ও ফতোয়ার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

ফতোয়ার বৈধতার হিকমত (حكمة مشروعيتها): ইসলামে ফতোয়া প্রবর্তনের পেছনে বহুবিধ হিকমত বা প্রজ্ঞাময় কারণ রয়েছে। এর প্রধান কয়েকটি হিকমত নিচে আলোচনা করা হলো:

১. দ্বীনের সংরক্ষণ (حفظ الدين): ফতোয়ার মাধ্যমে দ্বীনের সঠিক রূপরেখা সংরক্ষিত থাকে। যুগের পরিবর্তনে মানুষের জীবনে নতুন নতুন সমস্যা (যেমন—ডিজিটাল লেনদেন, আধুনিক চিকিৎসা) সৃষ্টি হয়। ফতোয়ার মাধ্যমেই এগুলোর শরয়ী সমাধান দেওয়া হয়, ফলে দ্বীন বিকৃত হতে পারে না এবং মানুষ বিদআত থেকে মুক্ত থাকে।

২. আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন (تطبيق أحكام الله): মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট। কিন্তু সকল বিষয়ে আল্লাহর হুকুম কী, তা সাধারণ মানুষের জানা থাকে না। মুফতি ফতোয়ার মাধ্যমে মানুষকে হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজ সম্পর্কে জানিয়ে আল্লাহর হুকুম পালনে সহায়তা করেন। এটি 'ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া' বা নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে আলেমদের দায়িত্ব।

৩. বিবাদ নিরসন ও সামাজিক শান্তি (رفع النزاع): সমাজে জমিজমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার বণ্টন নিয়ে প্রায়ই বিবাদ সৃষ্টি হয়। বিচারকের কাছে যাওয়ার আগে মানুষ মুফতির কাছে ফতোয়া জানতে চায়। মুফতি যখন শরীয়তের দলিল দিয়ে হুকুম স্পষ্ট করেন, তখন আল্লাহভীরু মানুষেরা তা মেনে নেয়। ফলে আদালতে যাওয়ার আগেই অনেক বড় বড় সামাজিক বিবাদ মীমাংসা হয়ে যায়।

৪. অজ্ঞতা দূরীকরণ (إزالة الجهل): অজ্ঞতা মানুষের জন্য অন্ধকারস্বরূপ। ফতোয়া মানুষকে সেই অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। সাধারণ মানুষ যখন কোনো বিষয়ে সন্দিহান হয়, ফতোয়া তাদের সন্দেহ দূর করে সঠিক পথের দিশা দেয়।

৫. মুফতি ও মুস্তফতির সওয়াব অর্জন: যিনি ফতোয়া জিজ্ঞেস করেন, তিনি ইলম অন্বেষণের সওয়াব পান। আর যিনি সঠিক ফতোয়া দেন, তিনি ইলম প্রচারের

সওয়াব পান। এমনকি ইজতেহাদ করে ভুল হলেও মুজতাহিদ সওয়াব পান, আর সঠিক হলে দ্বিগুণ সওয়াব পান।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, ফতোয়া হলো ইসলামি শরীয়তের প্রাণপ্রবাহ। এটি কেবল প্রশ্নের উত্তর নয়, বরং উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালনার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এর হিকমত হলো মানুষকে দুনিয়াবী সমস্যা থেকে মুক্ত করে আখেরাতমুখী করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সুগম করা।

প্রশ্ন-০২: ফতোয়া ও বিচার (ক্বাযা)-এ মধ্যে পার্থক্য কী এবং এই পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট ফলাফল কী কী?

ما الفرق بين الفتوى والقضاء (الحكم)، وما هي الآثار المترتبة على هذا الفرق؟

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া (الفتوى) এবং ক্বাযা বা বিচার (القضاء)—উভয়ই ইসলামি আইন ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি অনুষঙ্গ। বাহ্যত উভয়টির কাজ মানুষের সমস্যার সমাধান দেওয়া মনে হলেও, এদের প্রকৃতি, প্রয়োগক্ষেত্র এবং ক্ষমতার দিক থেকে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। একজন ফিকহ শিক্ষার্থী ও মুফতির জন্য এই পার্থক্য জানা অপরিহার্য।

ফতোয়া ও ক্বাযার পার্থক্য (الفرق بين الفتوى والقضاء): আল-কারাফী (রহ.) তাঁর 'আল-ইহকাম' গ্রন্থে এবং হানাফি ফকিহগণ ফতোয়া ও ক্বাযার মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলো নির্ণয় করেছেন। বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	ফতোয়া (الفتوى)	বিচার বা ক্বাযা (القضاء)
১. সংজ্ঞা ও প্রকৃতি	শরয়ী হুকুম সম্পর্কে সংবাদ বা তথ্য প্রদান করা (الإخبار)। এখানে মুফতি হলেন সংবাদাতা (Mukhbir)।	শরয়ী হুকুমের মাধ্যমে বিবাদমান পক্ষের ওপর রায় কার্যকর করা (الإلزام)। বিচারক হলেন বাধ্যকারী (Mulzim)।

২. বাধ্যবাধকতা	ফতোয়া মানা আইনগতভাবে বাধ্যবাধকতামূলক নয়। প্রশ্নকারী চাইলে মানতে পারেন, অথবা অন্য মুফতির কাছে যেতে পারেন।	বিচারকের রায় মানা বিবাদমান পক্ষের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা তা কার্যকর হয়।
৩. পরিসর (Scope)	ফতোয়ার পরিসর ব্যাপক। ইবাদত, আকাইদ, মুআমালাত সব বিষয়ে ফতোয়া দেওয়া যায়।	ক্বাযার পরিসর সাধারণত বিবাদ, দাবি-দাওয়া, দণ্ডবিধি এবং অধিকার আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইবাদত বা আকাইদ নিয়ে সাধারণত বিচার হয় না।
৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	এর মূল লক্ষ্য হলো দ্বীনি বিধান জানানো এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা (দিয়ানাত)।	এর মূল লক্ষ্য হলো ইহকালীন বিবাদ নিরসন করা, অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজে ন্যায়বিচার কায়েম করা।

পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট ফলাফল (الآثار المترتبة على الفرق): ফতোয়া ও ক্বাযার এই তাত্ত্বিক পার্থক্যের কারণে বাস্তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল বা 'আসার' (آثار) সৃষ্টি হয়। যথা:

১. দিয়ানাতান বনাম ক্বাযাআন (ধর্মীয় দায়বদ্ধতা বনাম আইনগত রায়): ফতোয়া মানুষের 'বাতিন' বা অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়, যাকে 'দিয়ানাত' বলা হয়। অন্যদিকে বিচারক বাহ্যিক সাক্ষী ও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে রায় দেন, যাকে 'ক্বাযা' বলা হয়। *উদাহরণ:* একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিল কিন্তু আদালতে অস্বীকার করল এবং স্ত্রীর কাছে কোনো সাক্ষী নেই।

- **বিচারক:** প্রমাণের অভাবে তালাক হয়নি বলে রায় দেবেন এবং স্ত্রীকে স্বামীর সাথে থাকার আদেশ দেবেন।
- **ফতোয়া:** মুফতি বলবেন, "যেহেতু তুমি তালাক দিয়েছ (আল্লাহ জানেন), তাই দিয়ানাতান (ধর্মীয়ভাবে) স্ত্রী তোমার জন্য হারাম। আদালতের রায় যা-ই হোক, তুমি তার সাথে সংসার করতে পারবে না।"

২. রায় রদ বা বাতিল হওয়া: মুফতির ফতোয়া যদি স্পষ্ট কিতাব বা ইজমার বিরোধী হয়, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশোধনযোগ্য। কিন্তু বিচারকের রায় (ইজতেহাদি বিষয়ে হলে) সাধারণত অন্য বিচারক বাতিল করতে পারেন না, যাতে বিচারের স্থিতিশীলতা নষ্ট না হয়। তবে বিচারক যদি স্পষ্ট নস (কুরআন-সুন্নাহ) বিরোধী রায় দেন, তবে তা বাতিল হবে।

৩. মুফতি ও বিচারকের যোগ্যতা: ফতোয়া দেওয়ার জন্য বিচারক হওয়ার মতো রাষ্ট্রীয় নিয়োগ বা প্রশাসনিক ক্ষমতা জরুরি নয়; কেবল ইলমি যোগ্যতা ও তাকওয়া থাকলেই চলে। কিন্তু ক্বাযা বা বিচারকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া (Wilayah) অপরিহার্য শর্ত।

৪. আমল করার বাধ্যবাধকতা: সাধারণ মানুষ মুফতির ফতোয়া শুনলে তা মানা তার তাকওয়ার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু বিচারকের রায় শোনার পর তা মানা ওয়াজিব হয়ে যায়, এমনকি নিজের মতের বিরুদ্ধে হলেও।

উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, ফতোয়া হলো আল্লাহর বিধানের সংবাদ দেওয়া, আর ক্বাযা হলো সেই বিধান প্রয়োগ করা। মুফতি মানুষের বিবেক ও পরকালকে জাগ্রত করেন, আর বিচারক সমাজ ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে উভয়েরই ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং একে অপরের পরিপূরক।

প্রশ্ন-০৩: 'ইলমুল ফতোয়া' কী? মুফতী যে সকল মূল উৎসের উপর নির্ভর করেন, তা কী কী?

(ما هو "علم الفتوى"؟ وما هي أهم مصادره التي يعتمد عليها المفتي؟)

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া প্রদান করা কোনো সাধারণ কাজ নয়, বরং এটি শরীয়তের একটি সূক্ষ্ম বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান বা শাস্ত্রটিকেই 'ইলমুল ফতোয়া' বলা হয়। একজন মুফতিকে ফতোয়া প্রদানের সময় নির্দিষ্ট কিছু উৎস ও মূলনীতির ওপর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। হানাফি মাযহাবে এই উৎসগুলোর একটি সুনির্দিষ্ট ক্রমবিন্যাস বা তারতীব রয়েছে।

'ইলমুল ফতোয়া'-এর পরিচয় (تعريف علم الفتوى): 'ইলমুল ফতোয়া' হলো এমন একটি শাস্ত্র, যার মাধ্যমে ফতোয়া প্রদানের নীতিমালা, মুফতির যোগ্যতা,

ফতোয়া লেখার পদ্ধতি (Adab al-Fatwa), এবং বিভিন্ন মতের মধ্য থেকে শক্তিশালী মতটি বাছাই করার নিয়মাবলি (Rules of Tarjih) জানা যায়। সহজ কথায়, ফিকহ হলো বিধানের জ্ঞান, আর 'ইলমুল ফতোয়া' হলো সেই বিধানটি মানুষের কাছে সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করার জ্ঞান। সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত 'উসূলুল ইফতা' বিষয়টি মূলত এই জ্ঞানেরই অংশ।

মুফতির নির্ভর করার মূল উৎসসমূহ (المصادر المعتمدة للمفتي): একজন হানাফি মুফতি যখন কোনো মাসআলার সমাধান খুঁজবেন, তখন তিনি এলোমেলোভাবে খুঁজবেন না। তাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত উৎসগুলোর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করতে হবে:

১. আল-কুরআন (القرآن الكريم): শরীয়তের প্রথম ও প্রধান উৎস। মুফতি সর্বপ্রথম আল্লাহর কিতাবে সমাধানের খোঁজ করবেন। যদি কুরআনের স্পষ্ট আয়াত (নস) পাওয়া যায়, তবে অন্য কোনো দলিলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

২. আস-সুন্নাহ (السنة النبوية): যদি কুরআনে সরাসরি সমাধান না পাওয়া যায়, তবে মুফতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ বা হাদিসের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। হাদিস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হানাফি উসুল অনুযায়ী মুতাওয়াতির, মাশহুর ও খবরে ওয়াহিদের স্তরবিন্যাস লক্ষ্য রাখতে হয়।

৩. ইজমা (الإجماع): কুরআন ও সুন্নাহর পর তৃতীয় উৎস হলো ইজমা বা মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদগণের ঐকমত্য। যদি কোনো বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম বা পরবর্তী মুজতাহিদগণ একমত হয়ে থাকেন, তবে মুফতি সেই ইজমা অনুযায়ী ফতোয়া দেবেন।

৪. কিয়াস (القياس): যদি ওপরের তিনটি উৎসে সরাসরি সমাধান না পাওয়া যায়, তখন মুফতি 'কিয়াস' বা সাদৃশ্যের আশ্রয় নেবেন। অর্থাৎ, কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত কোনো মূল বিষয়ের (আসল) সাথে নতুন সমস্যার (ফারা) কারণ বা ইল্লত মিলিয়ে বিধান বের করবেন।

৫. ফিকহী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি (كتب المذهب المعتمدة): তাকলিদের এই যুগে মুফতিরা সরাসরি কুরআন-হাদিস থেকে ইজতেহাদ করেন না, বরং তারা মুজতাহিদ ইমামগণের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করেন। হানাফি মুফতির জন্য এই উৎসগুলোর স্তরবিন্যাস নিম্নরূপ:

- **ক. যাহিরুর রিওয়ায়াহ (ظاهر الرواية):** ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর প্রধান দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতামত যা নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেমন— মাবসুত, যিয়াদাত, জামে সগির ইত্যাদি। মুফতি সবার আগে এখান থেকে ফতোয়া দেবেন।

- **খ. নাওয়াদির (النوادر):** যদি যাহিরুর রিওয়ায়াতে মাসআলা না পাওয়া যায়, তবে নাওয়াদির বা বিরল বর্ণনাগুলো দেখা হয়।

- **গ. ফতোয়া ও ওয়াকিয়াত (الفتاوى والواقعات):** যদি পূর্ববর্তী স্তরে সমাধান না থাকে, তবে পরবর্তী যুগের ফকিহগণের ইজতেহাদ বা ফতোয়া গ্রন্থগুলো (যেমন— ফতোয়ায়ে কাজিখান, ফতোয়ায়ে শামী) দেখতে হবে।

৬. উরফ ও আদত (العرف والعادة): কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে শরীয়তের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই, সেখানে মুফতি সমাজের প্রচলিত প্রথা বা 'উর্ফ'-এর ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিতে পারেন। বিশেষ করে আধুনিক লেনদেনের ক্ষেত্রে উরফ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

উপসংহার (خاتمة): একজন মুফতি নিজের খেয়ালখুশি মতো ফতোয়া দিতে পারেন না। তাকে অবশ্যই এই উৎসগুলোর তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হয়। কুরআনের উপস্থিতিতে কিয়াস করা যেমন অবৈধ, তেমনি 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা নির্ভরযোগ্য মত থাকতে দুর্বল মতের ওপর ফতোয়া দেওয়াও অগ্রহণযোগ্য। 'ইলমুল ফতোয়া' মুফতিকে এই শৃঙ্খলা মেনে চলতে শেখায়।

প্রশ্ন-০৪: 'রসমুল মুফতী'-এর সংজ্ঞা কী? কখন এটি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়?

(ما هو تعريف "رسم المفتي"؟ ومتى نشأت الحاجة إلى تدوينه (كتابته)؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরীয়তে ফতোয়া প্রদান একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একজন মুফতি কেবল মাসআলা জানলেই হয় না, বরং সেই মাসআলাটি ফতোয়া হিসেবে প্রয়োগ করার যোগ্যতা ও পদ্ধতি জানা আবশ্যক। ফতোয়া প্রদানের এই পদ্ধতিগত জ্ঞানকেই 'রসমুল মুফতি' বলা হয়। হানাফি

মাযহাবে আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.)-এর 'শরহু উকুদি রসমিল মুফতি' এ বিষয়ক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ, যা কামিল শ্রেণীর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত।

'রসমুল মুফতী'-এর সংজ্ঞা (تعريف رسم المفتي): ১. আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): 'রসম' (رسم) শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো— চিহ্ন, দাগ, রীতি, প্রথা বা পদ্ধতি। আর 'মুফতি' (المفتي) হলেন যিনি শরয়ী বিধান বর্ণনা করেন। সুতরাং শাব্দিক অর্থে 'রসমুল মুফতি' হলো মুফতির রীতি বা পদ্ধতি।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহ ও উসুলবিদগণের পরিভাষায়:

"যে সকল সুনির্দিষ্ট মূলনীতি ও বিধিমালার ওপর ভিত্তি করে একজন মুফতি মাযহাবের বিভিন্ন মতের মধ্য থেকে সঠিক মতটি বাছাই করেন, দুর্বল ও সবল মতের পার্থক্য করেন এবং প্রশ্নকারীর জন্য ফতোয়া লিপিবদ্ধ করেন, সেই শাস্ত্রকে 'রসমুল মুফতি' বলা হয়।"

সহজ কথায়, মুফতি কীভাবে ফতোয়া দেবেন, কোন কিতাব থেকে দেবেন এবং মতভেদের সময় কোন মতটিকে প্রাধান্য দেবেন— এই নিয়মাবলিই হলো রসমুল মুফতি।

এটি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ও প্রেক্ষাপট (تاريخ التدوين وسبب الحاجة): ইসলামের সোনালী যুগে, বিশেষ করে সাহাবা, তাবেয়িন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে (প্রথম তিন শতাব্দী) 'রসমুল মুফতি' নামে আলাদা কোনো শাস্ত্র বা কিতাব লেখার প্রয়োজন ছিল না। কারণ: ১. তাঁরা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে ইজতেহাদ করার যোগ্যতা রাখতেন। ২. তাঁদের মধ্যে ফিকহী মেধা ও তাকওয়া প্রবল ছিল।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে কয়েকটি কারণে এই শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়:

১. ইজতেহাদি যোগ্যতার হ্রাস: কালের বিবর্তনে যখন মুজতাহিদ ইমামগণের সংখ্যা কমে গেল এবং 'তাকলিদ' (অনুসরণ)-এর যুগ শুরু হলো, তখন পরবর্তী যুগের আলেমদের জন্য সরাসরি কুরআন-হাদিস থেকে বিধান বের করা কঠিন হয়ে পড়ল। তাঁরা ইমামদের মতামতের ওপর নির্ভর করতে শুরু করলেন।

২. মাযহাবে মতভেদের আধিক্য: হানাফি মাযহাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর হাজার হাজার মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। অনেক সময় একই বিষয়ে একাধিক বর্ণনা (রিওয়ায়াত) পাওয়া যায়। যেমন— কোনো মাসআলায় ইমাম আবু হানিফার দুটি মত, আবার কোনোটিতে ছাত্র ও শিক্ষকের মতভেদ। এমতাবস্থায় মুফতি কোন মতের ওপর ফতোয়া দেবেন, তা নির্ধারণের জন্য নীতিমালার প্রয়োজন হলো।

৩. দুর্বল ও সবল মতের মিশ্রণ: মাযহাবের কিতাবগুলোতে 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' (নির্ভরযোগ্য বর্ণনা) এবং 'নাওয়াদির' (বিরল বর্ণনা)-এর মিশ্রণ ঘটতে থাকে। অযোগ্য মুফতিরা অনেক সময় দুর্বল বা বাতিল মতের ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিতে শুরু করেন, যা উম্মাহর জন্য বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪. বিচার ও ফতোয়ায় শৃঙ্খলা আনয়ন: বিচারক ও মুফতিরা যেন একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন এবং সাংঘর্ষিক রায় না দেন, সেজন্য মাযহাবের 'মুফতা বিহি' (যার ওপর ফতোয়া প্রদত্ত) কওলের একটি মানদণ্ড দাঁড় করানোর প্রয়োজন হয়।

লিপিবদ্ধকরণের ইতিহাস: এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে হিজরি চতুর্থ শতকের পর থেকে ফকিহগণ ফতোয়ার নীতিমালা লেখা শুরু করেন। হানাফি মাযহাবে আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'উকুদু রসমিল মুফতি' এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'শরহু উকুদি রসমিল মুফতি' রচনা করেন, যা বর্তমানে মুফতিদের জন্য সংবিধানতুল্য। এতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুফতির জন্য মাযহাবের শক্তিশালী মতটি (Rajih) গ্রহণ করা ওয়াজিব এবং দুর্বল মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হারাম, যতক্ষণ না কোনো শরয়ী জরুরত দেখা দেয়।

উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, 'রসমুল মুফতি' হলো ফতোয়া জগতের ট্রাফিক সিগন্যাল বা রোডম্যাপ। মুফতি যেন ভুলের পথে না যান এবং উম্মাহকে সঠিক সমাধান দিতে পারেন, সেজন্য এই শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হয়েছে।

প্রশ্ন-০৫: ইসলামী সমাজ সেবায় ফতোয়ার তিনটি প্রধান শরয়ী উদ্দেশ্য উল্লেখ কর।

اذكر ثلاثة من أبرز المقاصد الشرعية للفتوى في خدمة المجتمع الإسلامي.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরীয়তে ফতোয়া কেবল একটি আইনি প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি সমাজ সংস্কার, জনকল্যাণ এবং দ্বীনি পরিবেশ বজায় রাখার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ফতোয়ার মূল লক্ষ্য হলো 'মাকাসিদে শরীয়াহ' বা শরীয়তের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করা। সমাজ সেবায় ফতোয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলামী সমাজ সেবায় ফতোয়ার তিনটি প্রধান শরয়ী উদ্দেশ্য (المقاصد الشرعية للفتوى):

১. দ্বীনের সংরক্ষণ ও বিদআত প্রতিরোধ (حفظ الدين ومحاربة البدع): ফতোয়ার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজে দ্বীনের সঠিক রূপরেখা টিকিয়ে রাখা।

- **বিবরণ:** মানুষের মধ্যে যখন কুসংস্কার, শিরক ও বিদআত ছড়িয়ে পড়ে, তখন মুফতি ফতোয়ার মাধ্যমে হক ও বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট করেন। সমাজে প্রচলিত ভুল প্রথাগুলোকে শরীয়তের দলিলাদি দ্বারা খণ্ডন করে সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করা ফতোয়ার কাজ।

- **উদাহরণ:** কারও মৃত্যু হলে সমাজে প্রচলিত কুলখানি বা চল্লিশার নামে যে ভোজের আয়োজন হয়, ফতোয়ার মাধ্যমে ওলামায়ে কেরাম একে বিদআত ও কুপ্রথা হিসেবে চিহ্নিত করে সমাজকে অপচয় ও গুনাহ থেকে রক্ষা করেন। এটি 'হিফজুদ্দিন' বা দ্বীন সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

২. সামাজিক বিবাদ নিরসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা (رفع النزاع وإقامة العدل): আদালতের বাইরে সামাজিকভাবে বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে ফতোয়া অসামান্য ভূমিকা রাখে। এটি ফতোয়ার একটি ব্যবহারিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য।

- **বিবরণ:** জমিজমা বণ্টন, ব্যবসায়িক লেনদেন কিংবা পারিবারিক কলহের ক্ষেত্রে মানুষ আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা ও খরচ থেকে বাঁচতে মুফতির শরণাপন্ন হয়। মুফতি আল্লাহভীরুতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শরীয়তের ফয়সালা জানিয়ে দেন। যেহেতু মুসলমানরা শরীয়তকে ভালোবাসে, তাই

তারা আদালতের রায়ের চেয়ে মুফতির ফতোয়াকে হৃদয়ে বেশি ধারণ করে এবং বিবাদ মিটিয়ে ফেলে।

- **উদাহরণ:** মিরাস বা উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে বোনের হক ভাইয়েরা দিতে চায় না। মুফতি যখন ফতোয়া দেন যে, "বোনের হক না দিলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না এবং হারাম ভক্ষণ করা হবে", তখন ভাইয়েরা ভয়ের কারণে হক আদায় করে দেয়। এভাবে ফতোয়া সমাজে ইনসাফ কায়েম করে।

৩. হালাল-হারাম স্পষ্টকরণ ও জীবনযাত্রার সমাধান (بيان الحلال والحرام والتيسير): আধুনিক যুগে মানুষের জীবনযাত্রায় নিত্যনতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। ফতোয়ার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আটকে রাখা নয়, বরং শরীয়তের গণ্ডিতে থেকে সমাধানের পথ দেখানো (Taysir)।

- **বিবরণ:** অর্থনীতি, চিকিৎসা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিষয় সামনে আসছে। যেমন— শেয়ার বাজার, ডিজিটাল কারেন্সি, টেস্টটিউব বেবি ইত্যাদি। এসব বিষয়ে মানুষ ধোঁয়াশায় থাকে। ফতোয়া এসব বিষয়ের হালাল ও হারামের সীমারেখা স্পষ্ট করে দেয়, যাতে মানুষ নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতে পারে।

- **সামাজিক প্রভাব:** যখন মানুষ নিশ্চিত হয় যে তার উপার্জন হালাল, তখন সমাজে বরকত আসে এবং অবৈধ উপার্জনের প্রবণতা কমে যায়। এটি একটি সুস্থ ও পবিত্র সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত।

উপসংহার (خاتمة): সারসংক্ষেপে, ফতোয়ার উদ্দেশ্য হলো— মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা, সমাজের বিবাদ দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং জীবন চলার পথকে শরীয়তের আলোকে সহজ করা। ফতোয়া যখন এই উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করে, তখন তা সমাজ সেবার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যমে পরিণত হয়।

প্রশ্ন-০৬: আধুনিক যুগে ফতোয়া ও ইজতেহাদের মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি স্পষ্ট কর।

(وضح طبيعة العلاقة بين الفتوى والاجتهاد في العصر الحديث.)

ভূমিকা (مقدمة): আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে মানবজীবনে এমন সব সমস্যা (Nawazil) দেখা দিয়েছে, যা পূর্ববর্তী ফিকহী কিতাবগুলোতে হুবহু পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় ফতোয়া প্রদানের জন্য ইজতেহাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ফতোয়া ও ইজতেহাদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও অবিচ্ছেদ্য।

ফতোয়া ও ইজতেহাদের সংজ্ঞা ও সম্পর্ক (التعريف والعلاقة):

- **ফতোয়া:** কোনো জিজ্ঞাসিত বিষয়ে শরয়ী বিধান জানানো।
- **ইজতেহাদ:** শরয়ী দলিল থেকে বিধান বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো।
- **সম্পর্ক:** এদের সম্পর্ক হলো 'আম ও খাস' (ব্যাপক ও বিশেষ)-এর মতো। সকল মুজতাহিদই মুফতি, কিন্তু সকল মুফতি মুজতাহিদ নন। ফতোয়া হলো ফলাফল, আর ইজতেহাদ হলো সেই ফলাফলে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া বা মাধ্যম।

আধুনিক যুগে সম্পর্কের প্রকৃতি (طبيعة العلاقة في العصر الحديث): বর্তমান প্রেক্ষাপটে ফতোয়া ও ইজতেহাদের সম্পর্ককে নিম্নোক্ত কয়েকটি ধাপে ব্যাখ্যা করা যায়:

১. নতুন সমস্যার সমাধানে ইজতেহাদের অপরিহার্যতা: আধুনিক যুগে এমন অনেক বিষয় সৃষ্টি হয়েছে (যেমন— ক্রিপ্টোকারেন্সি, অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট, ক্লোনিং), যার সরাসরি সমাধান কুরআন, সুন্নাহ বা পুরোনো ফিকহের কিতাবে নেই। এমতাবস্থায় একজন মুফতি কেবল কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে ফতোয়া দিতে পারেন না। তাকে ইজতেহাদের আশ্রয় নিতে হয়। অর্থাৎ, আধুনিক ফতোয়া ইজতেহাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

২. 'ইজতেহাদে জামায়ি' (সম্মিলিত ইজতেহাদ)-এর যুগ: আগেকার যুগে একজন ব্যক্তি মুজতাহিদে মুতলাক (স্বাধীন মুজতাহিদ) হতে পারতেন। কিন্তু

আধুনিক জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা এত বিস্তৃত যে, একজন ব্যক্তির পক্ষে সব বিষয়ে জ্ঞান রাখা অসম্ভব। তাই আধুনিক যুগে ফতোয়া ও ইজতেহাদের সম্পর্ক ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সরে এসে 'প্রতিষ্ঠানিক বা সম্মিলিত' রূপ নিয়েছে।

- **প্রয়োগ:** ওআইসি (OIC)-এর ফিকহ একাডেমি, ভারতের ফিকহ একাডেমি বা বাংলাদেশের ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারগুলোর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো সম্মিলিতভাবে ইজতেহাদ করে ফতোয়া প্রদান করে। এখানে মুফতি, ডাক্তার, অর্থনীতিবিদ ও বিজ্ঞানীরা একসাথে বসেন।

৩. তাহকিক ও তারজিহ (বাছাই ও প্রাধান্য): আধুনিক মুফতিরা সাধারণত নতুন করে মূলনীতি তৈরি করেন না (যা মুজতাহিদে মুতলাকের কাজ), বরং তাঁরা পূর্ববর্তী ইমামদের উসুল বা মূলনীতি ব্যবহার করে আধুনিক সমস্যার সমাধান করেন। একে 'ইজতেহাদ ফিল মাসায়েল' বা 'তাখরিজ' বলা হয়। ফতোয়া দেওয়ার সময় তাঁরা বিভিন্ন মাযহাবের মতামতের মধ্যে 'তুলনামূলক ফিকহ' (Fiqh al-Muqaran)-এর আলোকে ইজতেহাদ করে যা যুগের জন্য উপযোগী, সেই মতটিকে প্রাধান্য দেন।

৪. নস (Text) ও বাস্তবতার সমন্বয়: আধুনিক ফতোয়ার ক্ষেত্রে মুফতিকে ইজতেহাদ করতে হয় 'নস' (কুরআন-হাদিস) এবং 'ওয়াকিয়া' (বাস্তব ঘটনা)-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য। প্রথা বা 'উরফ' পরিবর্তনের কারণে অনেক আগের ফতোয়া এখন অচল হতে পারে। মুফতি ইজতেহাদের মাধ্যমে নির্ধারণ করেন যে, কোথায় আগের হুকুম বহাল থাকবে আর কোথায় পরিবর্তনের প্রয়োজন।

উপসংহার (خاتمة): আধুনিক যুগে ফতোয়া ও ইজতেহাদ একে অপরের পরিপূরক। ইজতেহাদ ছাড়া আধুনিক ফতোয়া অচল ও স্থবির হয়ে পড়বে, আর ফতোয়া ছাড়া ইজতেহাদ কেবল তাত্ত্বিক গবেষণায় সীমাবদ্ধ থাকবে। উম্মাহর নতুন নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য যোগ্য মুফতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইজতেহাদই হলো সময়ের দাবি।

প্রশ্ন-০৭: অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ফতোয়া প্রদানের বিধান বর্ণনা কর, এর অবৈধতার প্রমাণ উল্লেখ কর।
(بين حكم الإفتاء لغير المؤهل، مع ذكر أدلة تحريم ذلك.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরীয়তে ফতোয়া প্রদান করা একটি অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব। এটি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের নিকট বিধান পৌঁছানোর নামান্তর। তাই এই পদের জন্য বিশেষ যোগ্যতা (Ahliyah) থাকা আবশ্যক। যোগ্যতা ছাড়া ফতোয়া দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ এবং সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক।

অযোগ্য ব্যক্তির পরিচয় (تعريف غير المؤهل): যিনি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন না, নস (Text) ও ইজতেহাদের মূলনীতি জানেন না এবং ফিকহী কিতাবাদি বোঝার সক্ষমতা রাখেন না, তাকে ফতোয়ার ক্ষেত্রে 'অযোগ্য' বা 'গাইরে আহাল' বলা হয়।

অযোগ্য ব্যক্তির ফতোয়া প্রদানের বিধান (حكم الإفتاء): সকল ফকিহ ও ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে (ইজমা), অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ফতোয়া প্রদান করা **হারাম এবং কবীরা গুনাহ**। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) বলেন, যদি কোনো মূর্খ ব্যক্তি সত্য কথাও বলে ফতোয়া হিসেবে, তবুও সে গুনাহগার হবে। কারণ সে এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে, যার অধিকার তার নেই।

অবৈধতার প্রমাণসমূহ (أدلة التحريم): অযোগ্য ব্যক্তির ফতোয়া প্রদান নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহে অসংখ্য দলিল রয়েছে:

১. কুরআনের দলিল (أدلة القرآن): আল্লাহ তায়ালা না জেনে কথা বলাকে নিজের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শামিল করেছেন। ইরশাদ হয়েছে: *"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না।"* (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৬) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: *"তোমরা আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করো না, যা তোমরা জানো না।"* (সূরা আরাফ: ৩৩)

২. হাদিসের দলিল (أدلة السنة): রাসূলুল্লাহ (সা.) অযোগ্য মুফতিদের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

- **হাদিস-১:** রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন: *"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ইলমকে (মানুষের অন্তর থেকে) ছিনিয়ে নেবেন না, বরং ওলামায়ে কেরামের*

মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদের নেতা বা মুফতি বানাবে। তাদের কাছে ফতোয়া চাওয়া হবে এবং তারা না জেনে ফতোয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

- **হাদিস-২:** অন্য হাদিসে এসেছে, *"যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া ফতোয়া দিল, তার গুনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর ওপর বর্তাবে।"* (আবু দাউদ)

- **হাদিস-৩:** বিচারক তিন প্রকার। তার মধ্যে দুই প্রকার জাহান্নামী। এক প্রকার হলো সেই ব্যক্তি, যে অজ্ঞতা সত্ত্বেও মানুষের বিচার ফয়সালা করে বা ফতোয়া দেয়। সে জাহান্নামী।

৩. বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির দলিল (الدليل العقلي): একজন ভুয়া ডাক্তার যেমন রোগীর শারীরিক ক্ষতি বা মৃত্যু ঘটাতে পারে, তেমনি একজন অযোগ্য মুফতি মানুষের ঈমান ও আমল ধ্বংস করে দিতে পারে। শারীরিক ক্ষতির চেয়ে ঈমানি ক্ষতি অনেক বেশি ভয়াবহ। তাই সমাজ ও দ্বীনের সুরক্ষার স্বার্থে অযোগ্যদের ফতোয়া দেওয়া নিষিদ্ধ।

অযোগ্য ফতোয়ার কুফল (المفاسد): ১. হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল সাব্যস্ত করা। ২. সমাজে বিশৃঙ্খলা (Fawda) সৃষ্টি হওয়া। ৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করা।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, ফতোয়া দেওয়ার জন্য কেবল আরবি জানা বা কয়েকটি হাদিস মুখস্থ করাই যথেষ্ট নয়; বরং ফিকহ ও উসুলের গভীর পাণ্ডিত্য প্রয়োজন। রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব হলো অযোগ্য মুফতিদের প্রতিরোধ করা, যেন তারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

প্রশ্ন-০৮: মুফতীর জন্য কি মুজতাহিদে মুতলাক্ব হওয়া শর্ত? এ বিষয়ে হানাফীদের অভিমত কী?

هل يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا مطلقا؟ وما هو رأي الحنفية في ذلك؟)

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া প্রদানের যোগ্যতা বা শর্তাবলি নিয়ে উসুলবিদদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে মুফতিকে কি 'মুজতাহিদে মুতলাক' (স্বাধীন মুজতাহিদ) হতে হবে, নাকি মুকাল্লিদ (অনুসারী) হলেও চলবে— এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। হানাফি মাযহাবে এ বিষয়ে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক সমাধান দেওয়া হয়েছে।

মুজতাহিদে মুতলাক্ব-এর পরিচয় (تعريف المجتهد المطلق): 'মুজতাহিদে মুতলাক' হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে শরয়ী বিধান বের করতে সক্ষম এবং কারো মাযহাব অনুসরণ করেন না। যেমন— ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.)।

শর্ত হওয়া বা না হওয়ার মতভেদ (الاختلاف): ১. শাফেয়ী ও হাম্বলিদের একাংশের মত: ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে, নীতিগতভাবে মুফতিকে মুজতাহিদ হতে হবে। মুকাল্লিদের জন্য ফতোয়া দেওয়া জায়েজ নেই, সে কেবল অন্যের ফতোয়া নকল (Naqil) করতে পারে।

২. হানাফিদের অভিমত (رأي الحنفية): হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী, পরবর্তী যুগে (বিশেষ করে চতুর্থ শতাব্দীর পর) ফতোয়া প্রদানের জন্য **'মুজতাহিদে মুতলাক' হওয়া শর্ত নয়**। বরং একজন যোগ্য 'মুকাল্লিদ' (যিনি ইমামের উসুল ও ফুরু সম্পর্কে জ্ঞানী) ফতোয়া দিতে পারেন।

হানাফিদের দলিলাদি ও যুক্তি:

ক. জরুরত বা প্রয়োজনীয়তা (الضرورة): যদি মুফতি হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত করা হয়, তবে বর্তমান যুগে ফতোয়ার দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, বর্তমানে মুজতাহিদে মুতলাক পাওয়া দুষ্কর। এতে সাধারণ মানুষ দ্বীনি সমাধান থেকে বঞ্চিত হবে এবং হারাজ (কঠিন সংকীর্ণতা) দেখা দেবে। অথচ শরীয়ত মানুষের জন্য সহজতা চায়।

খ. মুকাল্লিদ মুফতির অবস্থান: হানাফিদের মতে, যিনি মুজতাহিদ নন, তিনি মূলত নিজের পক্ষ থেকে ফতোয়া দেন না। তিনি মুজতাহিদ ইমামের ফতোয়াটি উদ্ধৃত করেন এবং প্রশ্নকারীর সমস্যার সাথে মিলিয়ে দেন। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) তাঁর 'শরহু উকুদি রসমিল মুফতি' গ্রন্থে বলেন: *"বর্তমান যুগের মুফতি মূলত মুফতি নন, বরং তিনি মুফতিয়ে মুজতাহিদের পক্ষ থেকে বর্ণনাকারী (Naqil)।"*

গ. মুকাল্লিদ মুফতির শর্তাবলি: যদিও মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়, তবে হানাফিদের মতে যে কেউ ফতোয়া দিতে পারবে না। মুকাল্লিদ মুফতির জন্য নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক: ১. **কিতাবের জ্ঞান:** মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব (যাহিরুর রিওয়ায়াহ) সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। ২. **ভাষাগত দক্ষতা:** আরবি ভাষা ও ফিকহী পরিভাষা বোঝার যোগ্যতা। ৩. **ন্যায়পরায়ণতা (আদালাত):** ফাসিক না হওয়া এবং তাকওয়াবান হওয়া। ৪. **মাসআলা চয়নের যোগ্যতা:** কোনটি শক্তিশালী মত (Rajih) আর কোনটি দুর্বল, তা পার্থক্য করার ক্ষমতা থাকা।

ইমাম রাযী (রহ.)-এর বক্তব্য: ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (রহ.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি মাযহাবের ইমামের কিতাব ও দলিলাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন, তবে তার জন্য সেই মাযহাব অনুসারে ফতোয়া দেওয়া বৈধ, যদিও তিনি নিজে মুজতাহিদ নন।

উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, হানাফি মাযহাবের ফয়সালা হলো— ফতোয়া প্রদানের জন্য ইজতেহাদের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছা জরুরি নয়। বরং মাযহাবের ইমামগণের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বোঝার এবং মানুষের সামনে উপস্থাপন করার যোগ্যতা থাকলেই ফতোয়া দেওয়া বৈধ। এটি উম্মাহর জন্য রহমতস্বরূপ।

ফতোয়ার আদব ও শর্তাবলি

প্রশ্ন-০৯: মতভেদপূর্ণ মাসায়েলসমূহে অগ্রাধিকার প্রদানের সময় মুফতীর জন্য আবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলো কী কী?

ما هي أهم القواعد التي يجب على المفتي الالتزام بها عند الترجيح في (المسائل الخلافية؟)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি ফিকহে একই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর শিষ্যদের (সাহিবাইন) মধ্যে, কিংবা পরবর্তী যুগের ফকিহদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এমতাবস্থায় মুফতি নিজের ইচ্ছামতো যেকোনো একটি মত গ্রহণ করতে পারেন না। সঠিক ফতোয়া দেওয়ার জন্য তাকে 'তারজিহ' বা অগ্রাধিকার প্রদানের সুনির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি অনুসরণ করতে হয়। একে 'উসূলুত তারজিহ' বলা হয়।

অগ্রাধিকার প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিসমূহ (قواعد الترجيح):

১. কিতাবের স্তরের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা (ترتيب الكتب): মুফতিকে সর্বপ্রথম **'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'** (নির্ভরযোগ্য বর্ণনা)-এর কিতাবগুলোতে সমাধান খুঁজতে হবে। যদি সেখানে একাধিক মত থাকে এবং কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া না থাকে, তবে **'নাওয়াদির'** এবং এরপর **'ফতোয়া ও ওয়াকিয়াত'**-এর কিতাব দেখতে হবে। যাহিরুর রিওয়ায়াহ-এর বিপরীতে অন্য কিতাবের মত গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. ইমামগণের মতের অগ্রাধিকার (ترجيح أقوال الأئمة):

- **সাধারণ নিয়ম:** সাধারণত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়।
- **সাহিবাইনের ঐকমত্য:** যদি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) একমত হন এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ভিন্ন মত পোষণ করেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমামের মতই প্রাধান্য পায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে দলিলে শক্তিশালী হওয়ার কারণে সাহিবাইনের মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়।
- **বিশেষ ক্ষেত্র:** বিচারিক বা কাজির রায়ের ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, কারণ তিনি প্রধান বিচারপতি

ছিলেন এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। আর মিরাস বা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত প্রাধান্য পায়।

৩. মুফতা বিহি কওল গ্রহণ করা (الأخذ بالقول المفتى به): কিতাবে যদি কোনো মতের শেষে **"এর ওপর ফতোয়া" (عليه الفتوى), "এর ওপর আমল" (عليه العمل)**, বা **"এটি গ্রহণযোগ্য" (هو المعتمد)**—এরূপ শব্দ থাকে, তবে মুফতিকে অবশ্যই সেই মতটি গ্রহণ করতে হবে। নিজের যুক্তি দিয়ে অন্য মত গ্রহণ করা যাবে না।

৪. উরফ ও পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখা (مراعاة العرف): যদি পূর্ববর্তী ফকিহগণের মতভেদ দলিলের ভিত্তিতে না হয়ে বরং তৎকালীন প্রথা বা 'উরফ'-এর ভিত্তিতে হয়ে থাকে, তবে বর্তমান যুগের মুফতি দেখবেন এখনকার প্রথা কী। যুগের পরিবর্তনের কারণে যদি আগের হুকুম মানুষের জন্য কষ্টকর হয়, তবে মুফতি সহজ ও যুগোপযোগী মতটিকে প্রাধান্য দেবেন। একে বলা হয়— *"যুগের পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তন।"*

৫. দুর্বল মত বর্জন করা (الأقوال الضعيفة اجتنا): মুফতির জন্য কোনো অবস্থাতেই 'শায' বা দুর্বল মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া জায়েজ নেই, যদি না কঠিন কোনো শরয়ী বাধ্যবাধকতা (জরুরত) দেখা দেয়। দুর্বল মতের অনুসরণ করাকে ফকিহগণ হারাম বলেছেন।

৬. শব্দশক্তির বিচার (قوة اللفظ): কিতাবে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমন— 'আসাহ' (অধিকতর শুদ্ধ) এবং 'সহিহ' (শুদ্ধ)। যদি কোথাও মতভেদ থাকে, তবে 'আসাহ' শব্দটি 'সহিহ'-এর ওপর প্রাধান্য পাবে।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য মুফতিকে মাযহাবের এই মূলনীতিগুলো নখদর্পণে রাখতে হয়। এই নীতিমালার বাইরে গিয়ে ফতোয়া দিলে তা মাযহাব বিরোধী ও অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে। মুফতি মূলত মাযহাবের আমানতদার, তাই আমানত রক্ষার্থে এই নিয়মগুলো মানা অপরিহার্য।

প্রশ্ন-১০: এই মূলনীতিটি ব্যাখ্যা কর : মুফতী হলেন সংবাদাতা, আর ফকীহ হলেন বিধানদাতা (শরীয়ত প্রণয়নকারী)-এর উদ্দেশ্যমূলক অর্থ বর্ণনা কর। (اشرح القاعدة "المفتي مخبر والفقيه مشرع" مع بيان المعنى المقصود.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় মুফতি এবং ফকিহ—উভয়েই দ্বীনের খাদেম। কিন্তু কাজের ধরন ও দায়িত্বের দিক থেকে তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যটি বোঝার জন্য একটি প্রসিদ্ধ উসুলী মূলনীতি হলো: "মুফতি হলেন সংবাদাতা (Mukhbir), আর ফকিহ হলেন বিধানদাতা বা মুশাররি (Musharri)।" এখানে 'বিধানদাতা' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ প্রকৃত বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ।

মূলনীতিটির ব্যাখ্যা (شرح القاعدة):

১. মুফতী হলেন সংবাদাতা (المفتي مخبر): 'মুফতি' শব্দের অর্থ ফতোয়া প্রদানকারী। উসুলবিদগণের মতে, মুফতি নিজের পক্ষ থেকে কোনো বিধান তৈরি করেন না। তাঁর কাজ হলো আল্লাহর হুকুমটি প্রশ্নকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া বা 'খবর' দেওয়া।

- **তাৎপর্য:** যখন কোনো ব্যক্তি মুফতির কাছে প্রশ্ন করেন, মুফতি তখন কুরআন, সুন্নাহ বা মুজতাহিদ ইমামের ইজতেহাদের আলোকে বলেন, "এ বিষয়ে আল্লাহর হুকুম হলো এই।" অর্থাৎ তিনি শরীয়তের বিধান সম্পর্কে মানুষকে সংবাদ দিচ্ছেন। এ কারণেই বলা হয়, "**المفتي مخبر عن الله**" (মুফতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদাতা)।
- **বাধ্যবাধকতা:** যেহেতু তিনি কেবল সংবাদাতা, তাই তাঁর কথা মানা বিচারকের রায়ের মতো আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক (Ilzam) নয়, বরং এটি দ্বীনি ও নৈতিকভাবে পালনীয় (Diyanatan)।

২. ফকীহ হলেন বিধানদাতা (الفقيه مشرع): এখানে 'ফকিহ' বলতে মূলত 'মুজতাহিদে মুতলাক' বা স্বতন্ত্র মুজতাহিদকে বোঝানো হয়েছে (যেমন— ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী রহ.)। যদিও প্রকৃত আইনদাতা (শারি') আল্লাহ তায়ালা, কিন্তু মুজতাহিদ ফকিহগণ যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ মন্থন করে গোপন বিধানগুলো (Ahkam) বের করে আনেন এবং উসুল বা মূলনীতি ঠিক করে দেন, তাই রূপক অর্থে তাঁদের 'মুশাররি' বা বিধান প্রণেতা বলা হয়।

- **তাৎপর্য:** একজন সাধারণ মুফতি (যিনি মুকাল্লিদ) সরাসরি বিধান তৈরি করতে পারেন না; তিনি ফকিহ বা মুজতাহিদের তৈরি করা কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দেন। ফকিহ 'উসূল' তৈরি করেন, আর মুফতি সেই উসূল অনুযায়ী 'ফুরু' (শাখা-প্রশাখা) মানুষের কাছে বর্ণনা করেন।

উদ্দেশ্যমূলক অর্থ (المعنى المقصود): এই মূলনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মুফতি এবং মুজতাহিদের কাজের পরিধি নির্ধারণ করা। **১. দায়িত্বের পার্থক্য:** ফকিহের কাজ হলো ইস্তিম্বাত (গবেষণা করে বিধান বের করা), আর মুফতির কাজ হলো ইখবার (সেই বিধানটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া)। **২. মর্যাদাগত অবস্থান:** ফকিহ বা মুজতাহিদ হলেন উস্তাদ বা মূল উৎসের মতো, আর মুফতি হলেন সেই উৎসের ধারক ও বাহক। বর্তমান যুগের মুফতিরা মূলত মুজতাহিদ ফকিহদের 'নাকিল' বা বর্ণনাকারী হিসেবে কাজ করেন।

উদাহরণ (مثال): ধরা যাক, ওজু ভঙ্গের কারণগুলো কী?

- **ফকিহ (মুজতাহিদ):** কুরআন ও হাদিস গবেষণা করে মূলনীতি ঠিক করেছেন যে, "শরীর থেকে নাপাক বের হলে ওজু ভেঙে যায়।" এটি একটি তাত্ত্বিক বিধান বা 'তাশরি'।

- **মুফতি:** যখন কেউ প্রশ্ন করল, "আমার হাত কেটে রক্ত বের হয়েছে, আমার ওজু আছে কি?" মুফতি উত্তর দেবেন, "আপনার ওজু ভেঙে গেছে।" এখানে মুফতি নতুন আইন বানাননি, বরং ফকিহের নির্ধারিত বিধানটি প্রশ্নকারীর অবস্থার ওপর প্রয়োগ করে সংবাদ দিলেন।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, মুফতি হলেন শরীয়তের সংবাদাতা, যিনি মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান দেন। আর ফকিহ হলেন সেই সমাধানের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনাকারী। উভয়ের সমন্বয়েই শরীয়তের বাস্তবায়ন পূর্ণতা পায়।

প্রশ্ন-১১: প্রশ্নকারীকে বরণ করা ও তার প্রশ্নের উত্তর প্রদানের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ 'আদাবুল ফতোয়া' উল্লেখ কর।
(اذكر أهم "آداب الفتوى" المتعلقة باستقبال المستفتي والإجابة عن سؤاله.)

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া প্রদান কেবল জ্ঞানের বিষয় নয়, এটি একটি ইবাদত ও মহান দায়িত্ব। তাই মুফতিকে অবশ্যই কিছু শিষ্টাচার বা 'আদাব' মেনে চলতে হয়। বিশেষ করে যিনি ফতোয়া জানতে আসেন (মুস্তফতি), তাঁর সাথে মুফতির আচরণ কেমন হবে— এ বিষয়ে 'আদাবুল মুফতি' গ্রন্থে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে।

প্রশ্নকারীকে বরণ ও উত্তর প্রদানের আদবসমূহ (آداب استقبال المستفتي والجواب):

১. উত্তম আচরণ ও বিনয় (حسن الخلق والتواضع): মুফতির প্রধান গুণ হলো বিনয়। যখন কোনো প্রশ্নকারী আসবেন, মুফতি তাঁকে স্বাগত জানাবেন। প্রশ্নকারী যদি সাধারণ বা গরিব মানুষও হন, তবুও তাঁকে অবজ্ঞা করা যাবে না। মুফতি হাসিমুখে কথা বলবেন, যাতে প্রশ্নকারী ভয় না পান এবং মন খুলে সমস্যা বলতে পারেন।

২. ধৈর্যের সাথে প্রশ্ন শোনা (الصبر والاستماع): প্রশ্নকারী কথা বলার সময় মুফতি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। মাঝপথে কথা কেড়ে নেওয়া বা বিরক্তি প্রকাশ করা আদবের খেলাফ। অনেক সময় সাধারণ মানুষ গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, সেক্ষেত্রে মুফতিকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রশ্ন করে বিষয়টি স্পষ্ট করে নিতে হবে।

৩. প্রশ্নকারীর অবস্থা বিবেচনা করা (مراعاة حال المستفتي): মুফতি কেবল মাসআলা বলবেন না, বরং প্রশ্নকারীর মানসিক অবস্থার দিকেও লক্ষ্য রাখবেন।

- যদি প্রশ্নকারী কোনো বিপদে পড়ে আসেন, তবে মুফতি তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন।
- যদি প্রশ্নকারী কোনো গুনাহের কাজ করে অনুতপ্ত হয়ে আসেন, তবে তাঁকে নিরাশ করবেন না, বরং তওবার পথ দেখাবেন।

৪. উত্তর প্রদানের ভাষা (لغة الجواب): উত্তরের ভাষা হতে হবে সহজ, সাবলীল এবং প্রশ্নকারীর বোঝার উপযোগী। কঠিন পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা অনুচিত, যা সাধারণ মানুষ বোঝে না। উত্তর হতে হবে স্পষ্ট, যাতে কোনো অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তি না থাকে।

৫. উপদেশ প্রদান (النصيحة): ফতোয়ার উত্তরের সাথে যদি মুফতি প্রয়োজন মনে করেন, তবে কিছু নসিহত বা উপদেশ জুড়ে দেবেন। বিশেষ করে প্রশ্নটি যদি কোনো অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে নম্রভাবে তাঁকে সতর্ক করবেন। একে 'ইফতা ও ইরশাদ' বলা হয়।

৬. রাগান্বিত অবস্থায় উত্তর না দেওয়া (الإفتاء في حال الغضب اجتنا): রাসূলুল্লাহ (সা.) রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করতে নিষেধ করেছেন। মুফতির জন্যও এটি প্রযোজ্য। অতিরিক্ত রাগ, ক্ষুধা, ঘুম বা অসুস্থতার সময় ফতোয়া দেওয়া উচিত নয়, কারণ এতে ভুল হওয়ার বা প্রশ্নকারীর সাথে খারাপ আচরণের আশঙ্কা থাকে।

৭. গোপনীয়তা রক্ষা করা (كتمان السر): প্রশ্নকারী অনেক সময় ব্যক্তিগত ও লজ্জাজনক বিষয়ে প্রশ্ন করেন (যেমন— স্বামী-স্ত্রীর গোপন বিষয়)। মুফতির জন্য ওয়াজিব হলো প্রশ্নকারীর নাম ও পরিচয় গোপন রাখা এবং বিষয়টি জনসমক্ষে প্রচার না করা।

৮. না জানা থাকলে 'জানি না' বলা (قول لا أدري): যদি মুফতি তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর না জানেন, তবে লজ্জিত না হয়ে স্পষ্টভাবে বলা উচিত, "আমি জানি না, আমাকে দেখতে হবে।" এটি মুফতির আমানতদারিতার প্রমাণ। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতো বড় ইমামও অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরে 'জানি না' বলতেন।

উপসংহার (خاتمة): মুফতি হলেন 'ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া' বা নবীদের উত্তরাধিকারী। তাই কেবল মাসআলা বয়ান করাই তাঁর কাজ নয়, বরং নববী চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের সমস্যার সমাধান দেওয়াই হলো প্রকৃত 'আদাবুল ফতোয়া'।

প্রশ্ন-১২: প্রশ্নের (ইস্তিফতা)-এর মধ্যে কী কী শর্ত থাকতে হবে যাতে তা উত্তর দেওয়ার উপযোগী হয়?

ما هي الشروط التي يجب توفيرها في السؤال (الاستفتاء) حتى يكون (صالحا للإجابة؟

ভূমিকা (مقدمة): একটি সঠিক ফতোয়া পাওয়ার জন্য প্রশ্নটি (ইস্তিফতা) সঠিক হওয়া জরুরি। প্রশ্ন যদি অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে মুফতির পক্ষে সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। এজন্য ফকিহগণ ইস্তিফতা বা প্রশ্নের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছেন।

প্রশ্নের (ইস্তিফতা) প্রয়োজনীয় শর্তাবলি (شروط الاستفتاء):

১. স্পষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতা (الوضوح والنظافة): লিখিত প্রশ্নের লেখা স্পষ্ট ও পাঠযোগ্য হতে হবে। কাটাকাটি বা অস্পষ্ট হাতের লেখা থাকলে মুফতি ভুল বুঝতে পারেন। প্রশ্নের ভাষা হতে হবে দ্ব্যর্থহীন। প্রশ্নে ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থ মুফতির কাছে পরিষ্কার হতে হবে।

২. বাস্তবসম্মত হওয়া (أن يكون واقعيا): প্রশ্নটি এমন বিষয়ের হতে হবে, যা বাস্তবে ঘটেছে বা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। কাল্পনিক, অসম্ভব বা অহেতুক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়।

- *হাদিস:* রাসূলুল্লাহ (সা.) 'আগালুত' (ধাঁধাঁ বা জটিল কাল্পনিক প্রশ্ন) অপছন্দ করতেন।
- *উদাহরণ:* "মানুষ যদি আকাশে ওড়ে এবং তখন সূর্য ডুবে, তবে রোজা কীভাবে ভাঙবে?"—বিমান আবিষ্কারের আগে এমন প্রশ্ন ছিল অহেতুক। তবে বর্তমানে যা প্রয়োজন, তা জিজ্ঞেস করা বৈধ।

৩. উপকারী হওয়া (الفائدة): প্রশ্নটি দ্বীন বা দুনিয়ার কোনো উপকারের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। নিছক তর্ক করা, মুফতিকে আটকানো বা মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা জায়েজ নেই। অনর্থক বিষয় (যেমন—আসহাবে কাহাফের কুকুরের নাম কী ছিল?) নিয়ে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

৪. ঘটনার পূর্ণ বিবরণ (Taswir al-Mas'ala): প্রশ্নে ঘটনার পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে হবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করলে উত্তর ভুল আসতে পারে।

- *উদাহরণ:* তালাকের মাসআলায় ঠিক কী শব্দ বলা হয়েছে, কতবার বলা হয়েছে, এবং কোন অবস্থায় (রাগ না স্বাভাবিক) বলা হয়েছে—এসব বিস্তারিত উল্লেখ থাকতে হবে।

৫. নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করা (عدم التشهير): সামাজিক বিবাদ বা ঝগড়ার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ না করে প্রশ্ন করা উত্তম। যেমন— "অমুক ব্যক্তি এমন করেছে" না বলে বলা উচিত "এক ব্যক্তি এমন করেছে, তার হুকুম কী?" যাতে গীবত বা মানহানি না হয়। তবে বিচারক বা কাজির কাছে নাম বলা বৈধ।

৬. আদব বা শিষ্টাচার রক্ষা করা (التأدب): প্রশ্নের শুরুতে ও শেষে সালাম এবং মুফতির প্রতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা উচিত। আদেশের সুরে বা ধমকের সুরে প্রশ্ন করা ইলমের আদব পরিপন্থী।

৭. সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক হওয়া (الاختصار): প্রশ্ন খুব বেশি দীর্ঘ করা উচিত নয় যা মুফতির সময় নষ্ট করে, আবার এত সংক্ষিপ্তও করা যাবে না যাতে মূল বিষয় বোঝা যায় না। অপ্রয়োজনীয় ভূমিকা বাদ দিয়ে মূল সমস্যাটি তুলে ধরতে হবে।

হানাফি মাযহাবে প্রশ্নের ধরণ: হানাফি কিতাব 'আদাবুল মুফতি'-তে উল্লেখ আছে যে, প্রশ্নকারীকে প্রশ্নের নিচে উত্তরের জন্য ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে। এবং প্রশ্নের কাগজটি যেন খুব পাতলা বা নিম্নমানের না হয়, যাতে লিখতে সমস্যা হয়।

উপসংহার (خاتمة): "প্রশ্ন হলো জ্ঞানের চাবিকাঠি।" প্রশ্ন যদি সঠিক ও শর্ত মেনে করা হয়, তবেই সঠিক উত্তর বা ফতোয়া আশা করা যায়। ভুল প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া ফতোয়া অনেক সময় সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাই ইস্তিফতা লেখার সময় এই শর্তগুলো লক্ষ্য রাখা জরুরি।

প্রশ্ন-১৩: মুফতীর ব্যক্তিগত 'আদাবুল মুফতী' এবং ফতোয়া লেখার সাথে সম্পর্কিত 'আদাবুল ফতোয়া'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
ما الفرق بين "آداب المفتي" المتعلقة بشخصه و"آداب الفتوى" المتعلقة بكتابة الفتوى؟

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া প্রদান বা 'ইফতা' ইসলামি শরীয়তের একটি পবিত্র ও মহান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য মুফতিকে দুই ধরনের শিষ্টাচার বা 'আদাব' মেনে চলতে হয়। একটি হলো তার ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচরণের সাথে সম্পৃক্ত (আদাবুল মুফতি), আর অন্যটি হলো ফতোয়া লেখা ও সম্পাদনার কারিগরি দিকের সাথে সম্পৃক্ত (আদাবুল ফতোয়া বা আদাবুল কিতাবাহ)। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) ও অন্যান্য ফকিহগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সংজ্ঞা ও পরিচয় (التعريف): ১. মুফতির ব্যক্তিগত আদব (آداب المفتي الشخصية): এটি মুফতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গুণাবলি নির্দেশ করে। অর্থাৎ একজন মুফতি ব্যক্তি হিসেবে কেমন হবেন, তার পোশাক, আখলাক, তাকওয়া এবং মানুষের সাথে আচরণের নীতিমালা এর অন্তর্ভুক্ত। **২. ফতোয়া লেখার আদব (آداب كتابة الفتوى):** ফতোয়ার কাগজ, লেখার ধরণ, ভাষা, দলিল উপস্থাপনের পদ্ধতি এবং সিল-স্বাক্ষর ব্যবহারের কারিগরি নিয়মাবলিকে ফতোয়া লেখার আদব বলা হয়।

পার্থক্যসমূহ (الفروق): বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য নিচে উভয় প্রকার আদবের পার্থক্য ছক আকারে তুলে ধরা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	মুফতির ব্যক্তিগত আদব (آداب المفتي)	ফতোয়া লেখার আদব (آداب الكتابة)
১. সম্পৃক্ততা	এটি সরাসরি মুফতির 'যাত' বা সত্তার সাথে জড়িত।	এটি ফতোয়ার কাগজ বা নথির (Document) সাথে জড়িত।
২. প্রধান ফোকাস	মুফতির নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিক আচরণ।	ফতোয়ার স্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা ও দৃশ্যমান সৌন্দর্য।

৩. উদাহরণ	তাকওয়া, ধৈর্য, গাম্ভীর্য, পরিষ্কার পোশাক পরা।	স্পষ্ট অক্ষরে লেখা, কাটাকাটি না করা, দোয়ার মাধ্যমে শুরু করা।
৪. লক্ষ্য	মুফতির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।	প্রশ্নকারীর বিভ্রান্তি দূর করা এবং সঠিক তথ্য সংরক্ষণ।

বিস্তারিত আলোচনা:

ক. মুফতির ব্যক্তিগত আদবসমূহ: ১. তাকওয়া ও ওারা (التقوى والورع): মুফতিকে অবশ্যই আল্লাহভীরু হতে হবে। হারাম তো বটেই, মাকরূহ ও সন্দেহজনক বিষয় থেকেও দূরে থাকতে হবে। ২. **ধৈর্য ও গাম্ভীর্য (الحلم والوقار):** মুফতিকে হতে হবে ধীরস্থির। প্রশ্নকারীর অবান্তর প্রশ্নে রেগে যাওয়া যাবে না। রাগান্বিত অবস্থায় ফতোয়া দেওয়া মাকরূহ। ৩. **উপহার বা ঘুষ গ্রহণ না করা:** ফতোয়ার বিনিময়ে কোনো হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ করা মুফতির নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাই এটি বর্জনীয়। ৪. **পোশাক ও পরিচ্ছন্নতা:** মুফতিকে সুন্নাহসম্মত ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষের মনে তার প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়।

খ. ফতোয়া লেখার আদবসমূহ: ১. স্পষ্ট হাতের লেখা: ফতোয়ার উত্তর এমনভাবে লিখতে হবে যেন সাধারণ মানুষ ও অন্য আলেমগণ সহজে পড়তে পারেন। অক্ষরের মাঝখানে অতিরিক্ত ফাঁক রাখা যাবে না, যাতে কেউ সেখানে কিছু ঢুকিয়ে জালিয়াতি করতে না পারে। ২. **দোয়া বা হামদ দ্বারা শুরু করা:** উত্তরের শুরুতে 'আল্লাহু আলাম', 'হুওয়াল মুওয়াফফিক' বা 'বিসমিল্লাহ' লেখা মুস্তাহাব। ৩. **প্রশ্ন ও উত্তরের সংযোগ:** উত্তরটি প্রশ্নের কাগজের সাথেই লেখা উত্তম। যদি আলাদা কাগজে লেখা হয়, তবে প্রশ্নের সারাংশ উল্লেখ করতে হবে। ৪. **দলিল উল্লেখ করা:** ফতোয়ার শেষে বা পাশে নির্ভরযোগ্য কিতাবের নাম, খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা জরুরি, যাতে অন্য আলেমগণ তা যাচাই করতে পারেন। ৫. **সিল ও স্বাক্ষর:** উত্তরের শেষে মুফতির স্পষ্ট নাম, স্বাক্ষর এবং মাদরাসা বা ফতোয়া বিভাগের সিলমোহর থাকতে হবে।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, 'আদাবুল মুফতি' মুফতিকে একজন আদর্শ মানুষে পরিণত করে, আর 'আদাবুল ফতোয়া' তার ফতোয়াকে একটি গ্রহণযোগ্য আইনি দলিলে রূপান্তর করে। ফতোয়া নির্ভুল ও কার্যকর হওয়ার জন্য উভয়ের সমন্বয় অপরিহার্য।

প্রশ্ন-১৪: ফকীহগণ কর্তৃক উল্লিখিত ফতোয়ার শর্তাবলি-এর মধ্যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত গণনা কর।
(عدد خمسة من أهم "شرائط الفتوى" التي ذكرها الفقهاء.)

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া হলো দ্বীনের বিধান বর্ণনা করা। যে কেউ চাইলেই ফতোয়া দিতে পারে না। ফতোয়া সহিহ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য ফকিহগণ মুফতি এবং ফতোয়া উভয়ের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত (Shara'it) আরোপ করেছেন। এগুলোকে 'শারায়েতুল ফতোয়া' বলা হয়। সিলেবাসের উসুলুল ইফতা অংশে এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে।

ফতোয়ার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত (خمسة من أهم شرائط الفتوى):

১. ইসলাম ও ঈমান (الإسلام): ফতোয়া প্রদানের প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো মুফতিকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কোনো অমুসলিম যতই পাণ্ডিত্য রাখুক না কেন, তার ফতোয়া বা ধর্মীয় রায় মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ফতোয়া হলো দ্বীনের বিষয়, আর কাফিরের দ্বীনের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই।

- *দলিল:* আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ কখনোই মুমিনদের ওপর কাফিরদের কোনো পথ (কর্তৃত্ব) রাখেননি।" (সূরা নিসা: ১৪১)

২. আকল বা সুস্থ মস্তিষ্ক (العقل): মুফতিকে অবশ্যই 'আকেল' বা সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে। পাগল, মানসিক ভারসাম্যহীন বা মাতাল ব্যক্তির ফতোয়া সহিহ নয়। কারণ ফতোয়া দেওয়ার জন্য গভীর চিন্তাশক্তি ও বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন, যা আকল ছাড়া সম্ভব নয়।

৩. ইলম বা ফিকহী জ্ঞান (العلم): ফতোয়া দেওয়ার জন্য কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এবং মাযহাবের মাসায়েল সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে হানাফি মুফতির জন্য 'উসুলুল ফিকহ' এবং 'রসমুল মুফতি' (ফতোয়া প্রদানের রীতি) জানা ফরজ। অজ্ঞ ব্যক্তির ফতোয়া দেওয়া হারাম।

- *রাসূল (সা.) বলেন:* "যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া ফতোয়া দেয়, তার গুনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর ওপর বর্তাবে।" (আবু দাউদ)

৪. আদালাত বা ন্যায়পরায়ণতা (العدالة): মুফতিকে অবশ্যই 'আদিল' বা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। ফাসিক (প্রকাশ্যে গুনাহগার) ব্যক্তির ফতোয়া গ্রহণযোগ্য

নয়, যদিও তার ইলম থাকে। কারণ ফতোয়া হলো দ্বীনের সংবাদ, আর ফাসিকের সংবাদের ওপর আস্থা রাখা যায় না। তবে হানাফি মাযহাবে প্রয়োজনে ফাসিকের ফতোয়া যদি সঠিক হয় এবং অন্য আলেমগণ তা সমর্থন করেন, তবে তা গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে, কিন্তু মুফতি হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে আদালাত শর্ত।

৫. ইস্তিকামাতুল ফাহাম বা সঠিক বুঝশক্তি (استقامة الفهم): কেবল কিতাব মুখস্থ থাকলেই চলবে না, বরং মুফতির সঠিক বুঝশক্তি থাকতে হবে। প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য বোঝা এবং সেই অনুযায়ী সঠিক মাসআলাটি প্রয়োগ করার যোগ্যতা থাকতে হবে। একে 'ফিকহুন নাফস' বা অন্তর্দৃষ্টি বলা হয়। যে ব্যক্তি মাসআলার আগাগোড়া বুঝতে পারে না, তার ফতোয়া দেওয়া জায়েজ নেই।

অন্যান্য শর্ত: উপরোক্ত পাঁচটি ছাড়াও বালেগ হওয়া, জাগতিক লোভে না পড়া এবং রাগান্বিত না থাকা ফতোয়ার শিষ্টাচার ও শর্তের অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার (خاتمة): ফতোয়া একটি আমানত। এই পাঁচটি শর্ত মূলত সেই আমানত রক্ষার ঢাল। অযোগ্য ও শর্তহীন ব্যক্তির হাতে ফতোয়ার দায়িত্ব অর্পিত হলে সমাজে বিভ্রান্তি ও ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে। তাই মুফতি নিয়োগ ও ফতোয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে এই শর্তগুলো যাচাই করা উম্মাহর জন্য জরুরি।

প্রশ্ন-১৫: যামানা ও স্থানের পরিবর্তন (প্রথার পরিবর্তন) কীভাবে ফতোয়ার শর্তাবলির উপর প্রভাব ফেলে?

(كيف يؤثر تغير الزمان والمكان (تغير الأعراف) على شروط الفتوى؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর স্থিতিস্থাপকতা (Flexibility) একে সর্বজনীন করেছে। ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে 'যামানা' (সময়), 'মাকান' (স্থান) এবং 'উরফ' (সামাজিক প্রথা)-এর পরিবর্তন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফিকহী মূলনীতি হলো: **"لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"** (যুগের পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তনকে অস্বীকার করা যায় না)।

প্রথার পরিবর্তনের প্রভাব ও ফতোয়ার শর্তাবলি:

১. মুফতির যোগ্যতার শর্তে প্রভাব: সাধারণত মুফতির জন্য কিতাবী জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট মনে করা হতো। কিন্তু যামানার পরিবর্তনের ফলে মুফতির জন্য আরেকটি

শর্ত যুক্ত হয়েছে—তা হলো **'মারিফাতু জামানিহি'** (নিজের যুগ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা)। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) বলেন, যে মুফতি তার যুগের মানুষের প্রথা, চালাকি ও পরিভাষা সম্পর্কে জানেন না, তিনি মানুষের ক্ষতি করবেন। তাই আধুনিক যুগে মুফতিকে কিতাবের জ্ঞানের পাশাপাশি অর্থনীতি, সমাজনীতি ও আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রাখতে হয়।

২. বিধান বা আহকামের পরিবর্তন: প্রথা বা উরফের পরিবর্তনের কারণে ফতোয়ার অনেক বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে মনে রাখতে হবে, কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য বিধান (নস) কখনো পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন হয় কেবল সেসব বিধান, যা তৎকালীন প্রথা বা যুক্তির ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছিল।

- **উদাহরণ-১ (কুরআন শিক্ষা ও পারিশ্রমিক):** পূর্ববর্তী ফকিহগণ কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়াকে হারাম ফতোয়া দিয়েছিলেন। কারণ তখন বায়তুল মাল থেকে শিক্ষকদের ভাতা দেওয়া হতো এবং মানুষের মাঝে দ্বীনি জজবা ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে যখন বায়তুল মাল বন্ধ হয়ে গেল এবং মানুষের আগ্রহ কমে গেল, তখন ফকিহগণ 'দ্বীন সংরক্ষণের স্বার্থে' কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়াকে জায়েজ ফতোয়া দিয়েছেন। এটি যামানার পরিবর্তনের প্রভাব।

- **উদাহরণ-২ (মুদ্রার মান):** আগেকার যুগে দিরহাম ও দিনার (স্বর্ণ-রৌপ্য) ছিল। এখন কাগজের মুদ্রা বা ডিজিটাল কারেন্সি এসেছে। ফতোয়া দেওয়ার সময় মুফতিকে এখনকার মুদ্রার মান ও ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনা করে যাকাত বা মোহরানার সিদ্ধান্ত দিতে হয়।

৩. উরফ বা প্রথার শর্তাবলি: যামানা পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে সব বিধান পাল্টে ফেলা যাবে না। ফতোয়ায় প্রথা বা উরফের প্রভাব ফেলার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে: ক. প্রথাটি ব্যাপক (আম) হতে হবে, বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা হলে চলবে না। খ. প্রথাটি শরীয়তের স্পষ্ট নস (কুরআন-হাদিস)-এর বিরোধী হতে পারবে না। যেমন—সুদ খাওয়া বর্তমানে প্রথা হয়ে গেলেও তা হালাল হবে না। গ. প্রথাটি ফতোয়া দেওয়ার সময় বিদ্যমান থাকতে হবে।

৪. সহজীকরণের প্রবণতা (Taysir): আধুনিক যুগে মানুষের ঈমানি দুর্বলতা ও কষ্টের কথা বিবেচনা করে মুফতিগণ ফতোয়ার ক্ষেত্রে 'আজিমত' (কঠিন বিধান)-এর পরিবর্তে 'রুখসত' (সহজ বিধান) বা দুর্বল মতের ওপর আমল করার

অনুমতি দিচ্ছেন কিছু ক্ষেত্রে। এটিও যামানার পরিবর্তনের প্রভাব। যেমন— যৌথ কারবার বা শেয়ার বাজারের কিছু আধুনিক পদ্ধতিকে শর্তসাপেক্ষে বৈধতা দেওয়া।

উপসংহার (خاتمة): যামানার পরিবর্তন ফতোয়ার মূল কাঠামোকে ধ্বংস করে না, বরং একে যুগের সাথে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। একজন দক্ষ মুফতি তিনিই, যিনি শরীয়তের মূলনীতি ঠিক রেখে যুগের চাহিদাকে সমন্বয় করতে পারেন। আল্লামা শামী (রহ.)-এর 'শরহু উকুদি রসমিল মুফতি' গ্রন্থে উরফের এই ব্যবহারকে মুফতির জন্য অপরিহার্য জ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১৬: 'আহলিইয়াতুল ফতোয়া' কী? এটি অর্জিত, নাকি আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা? প্রমাণসহ স্পষ্ট কর।
(ما هي "أهلية الفتوى"؟ وهل هي مكتسبة أم موهبة إلهية؟ وضح مع الدليل.)

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া প্রদান করা নবী-রাসূলগণের মিরাসি বা উত্তরাধিকারী দায়িত্ব। এটি কোনো সাধারণ পেশা নয়, বরং একটি গুরুদায়িত্ব। তাই যে কেউ চাইলেই ফতোয়া দিতে পারে না। এর জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। এই যোগ্যতাকে ফিকহের পরিভাষায় 'আহলিইয়াতুল ফতোয়া' বা ফতোয়া প্রদানের যোগ্যতা বলা হয়।

'আহলিইয়াতুল ফতোয়া'-এর পরিচয় (تعريف أهلية الفتوى): ১. আভিধানিক অর্থ: 'আহলিইয়াত' অর্থ যোগ্যতা, দক্ষতা বা উপযুক্ততা। **২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:** ফিকহবিদগণের মতে, আহলিইয়াতুল ফতোয়া হলো—

"এমন এক গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যা অর্জন করলে একজন ব্যক্তি শরয়ী দলিল (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস) থেকে বিধান বের করতে পারেন অথবা মুজতাহিদ ইমামগণের বের করা বিধানগুলো মানুষের জীবনের নতুন সমস্যার সাথে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।"

এটি কি অর্জিত (কাসবি), নাকি আল্লাহ প্রদত্ত (ওহবি)? ফতোয়ার যোগ্যতা অর্জিত নাকি জন্মগত বা আল্লাহ প্রদত্ত—এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের সুচিন্তিত অভিমত হলো: এটি **উভয়ের সমন্বয়**। কেবল পড়াশোনা করলেই মুফতি হওয়া

যায় না, আবার পড়াশোনা ছাড়া কেবল দোয়ার মাধ্যমেও মুফতি হওয়া যায় না। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো:

১. অর্জিত দিক (الجانب الكسبي): ফতোয়ার যোগ্যতার একটি বড় অংশ হলো 'কাসবি' বা প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জনযোগ্য। এর জন্য মুফতিকে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে কিতাব অধ্যয়ন করতে হয়।

- **আরবি ভাষা:** ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র ও শব্দভাণ্ডার আয়ত্ত করা।
- **উসূলুল ফিকহ:** বিধান বের করার মূলনীতি শেখা।
- **নাসিখ-মানসুখ:** রহিত ও রহিতকারী বিধান সম্পর্কে জানা। এই জ্ঞানগুলো চেষ্টার মাধ্যমেই অর্জন করতে হয়। কোনো ব্যক্তি ঘুমিয়ে থেকে সকালে উঠে মুফতি হতে পারেন না।

২. আল্লাহ প্রদত্ত দিক (الجانب الوهبي): ফতোয়ার যোগ্যতার রুহ বা প্রাণ হলো 'ওহবি' বা আল্লাহ প্রদত্ত নূর। একে 'ফিকহুন নাফস' বা অন্তর্দৃষ্টি বলা হয়। অনেক সময় একই কিতাব পড়ে দুজন ছাত্রের মধ্যে একজনের বুঝশক্তি (ফাহাম) অনেক গভীর হয়। এটি আল্লাহর দান। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ যাকে দেন, তিনিই প্রকৃত ফকিহ হন।

প্রমাণসমূহ (الأدلة):

ক. কুরআনের দলিল: আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া অবলম্বন করো), আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন।" (সূরা বাকারা: ২৮২) এই আয়াতে বোঝা যায়, মানুষের প্রচেষ্টার (তাকওয়া) সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা দান (ওহবি ইলম) জড়িত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে: *"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে তিনি তোমাদেরকে 'ফুরকান' (সত্য-মিথ্যা পার্থক্যের বিশেষ শক্তি) দান করবেন।"* (সূরা আনফাল: ২৯)

খ. হাদিসের দলিল: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা (ফিকহ) দান করেন।" (বুখারী ও মুসলিম) এখানে 'দান করেন' শব্দটি প্রমাণ করে যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ তোহফা।

গ. যুক্তির দলিল: আমরা দেখি যে, অনেক বড় আলেম অনেক কিতাব মুখস্থ রাখেন, কিন্তু জটিল সামাজিক সমস্যার সমাধানে ভুল করেন। আবার অনেক মুফতি কম কিতাব মুখস্থ নিয়েও সঠিক সমাধান দেন। এতে প্রমাণিত হয়, কিতাবী বিদ্যার বাইরেও আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি 'নূর' বা প্রজ্ঞা জরুরি, যা মুফতিকে সঠিক পথ দেখায়।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, 'আহলিইয়াতুল ফতোয়া' বা ফতোয়ার যোগ্যতা হলো পাখির দুই ডানার মতো। একটি ডানা হলো কঠোর পরিশ্রম ও কিতাব অধ্যয়ন (Kasb), আর অন্য ডানা হলো আল্লাহর দেওয়া মেধা ও তাওফিক (Wahb)। এই দুয়ের সমন্বয়েই একজন ব্যক্তি 'ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া' বা প্রকৃত মুফতির মর্যাদা লাভ করেন।

প্রশ্ন-১৭: মুফতীর মধ্যে থাকা আবশ্যক এমন পাঁচটি মৌলিক নৈতিক গুণাবলি উল্লেখ কর।

اذكر خمسة من الصفات الأخلاقية الأساسية التي يجب أن يتحلى بها المفتي.)

ভূমিকা (مقدمة): মুফতি হলেন শরীয়তের আমানতদার এবং আল্লাহর বিধানের স্বাক্ষরকারী। তার ব্যক্তিগত চরিত্র ও নৈতিকতা ফতোয়ার গ্রহণযোগ্যতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) এবং মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ.) তাঁদের কিতাবে মুফতির নৈতিক গুণাবলি বা 'আদাবুল মুফতি' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মুফতির পাঁচটি মৌলিক নৈতিক গুণাবলি (الصفات الأخلاقية للمفتي):

১. তাকওয়া ও আল্লাহভীতি (التقوى والورع): মুফতির সবচেয়ে প্রধান গুণ হলো তাকওয়া।

- **বিবরণ:** মুফতিকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি যা লিখছেন বা বলছেন, তার জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে

হবে। তাকে কেবল হারাম থেকে নয়, মাকরূহ ও সন্দেহজনক বিষয় থেকেও দূরে থাকতে হবে (ওয়ার')।

- **প্রভাব:** মুফতি মুত্তাকি না হলে তার ফতোয়ার মধ্যে দুনিয়াবী স্বার্থ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ ঢুকে যেতে পারে, যা উম্মাহর জন্য ধ্বংসাত্মক। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলতেন, "যে ব্যক্তি মনে করে না যে ফতোয়ার জন্য তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, তার ফতোয়া দেওয়া উচিত নয়।"

২. গাম্ভীর্য ও ধীরস্থিরতা (الوقار والسكينة): মুফতিকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও ধীরস্থির হতে হবে।

- **বিবরণ:** চটপটে স্বভাব, কথায় কথায় হাসি-ঠাট্টা করা বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাওয়া-দাওয়ার মতো নিচু স্বভাব মুফতির শানের খেলাফ। তার চালচলন ও কথাবার্তায় গাম্ভীর্য থাকতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ তাকে দেখলেই শ্রদ্ধাবোধ করে এবং তার ফতোয়ার প্রতি আস্থা পায়।

৩. ধৈর্য ও সহনশীলতা (الحلم والصبر): ফতোয়া বিভাগে নানা শ্রেণির মানুষ আসে। কেউ মূর্খ, কেউ রাগী, আবার কেউ অহেতুক প্রশ্নকারী।

- **বিবরণ:** মুফতিকে সাগরের মতো বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে। প্রশ্নকারীর কর্কশ ভাষায় রেগে যাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আখলাক ছিল ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। মুফতি যদি অধৈর্য হয়ে ভুল উত্তর দেন বা ধমক দেন, তবে মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবে।

৪. আমানতদারিতা ও গোপনীয়তা রক্ষা (الأمانة وكتمان السر): মুফতি হলেন সমাজের গোপন তথ্যের ভাণ্ডার।

- **বিবরণ:** মানুষ মুফতির কাছে এমন সব ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার (যেমন— জিনা, তালাক, গোপন পাপ) কথা বলে, যা তারা অন্য কাউকে বলতে পারে না। মুফতির জন্য ফরজ হলো এসব তথ্য আমানত হিসেবে গোপন রাখা। কারো গোপন কথা ফতোয়ার মজলিসে বা বাইরে প্রচার করা খেয়ানত ও কবীরা গুনাহ।

৫. দুনিয়াবিমুখতা ও নির্লোভ হওয়া (الزهد وعدم الطمع): ফতোয়াকে উপার্জনের মাধ্যম বানানো যাবে না।

- **বিবরণ:** মুফতিকে দুনিয়ার সম্পদ ও পদমর্যাদার লোভ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কেউ হাদিয়া বা উপহার দিলে যদি তা ফতোয়ার রায়ের ওপর প্রভাব ফেলার আশঙ্কা থাকে, তবে তা গ্রহণ করা হারাম (ঘুষ)। মুফতি হবেন সত্যের পতাকাবাহী, ধনীদের তুষ্ট করার জন্য তিনি ফতোয়া পরিবর্তন করবেন না।

উপসংহার (خاتمة): একজন মুফতি কেবল তার ইলম বা জ্ঞান দিয়ে মুফতি হন না, বরং তার আমল ও আখলাক দিয়েই মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেন। এই পাঁচটি গুণ যার মধ্যে নেই, তার ফতোয়া সঠিক হলেও মানুষ তা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে। তাই ইলমের সাথে এই নৈতিক গুণাবলি অর্জন করা মুফতির জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন-১৮: ফতোয়ার ক্ষেত্রে অবকাশ অন্বেষণ করা (তাতাব্বু রোখাস)-এর বিধান কী? মুফতীর জন্য কি তা শরীয়তভাবে বৈধ?

ما حكم تتبع الرخص (الترخص) في الفتوى، وهل يجوز للمفتي ذلك على الإطلاق؟

ভূমিকা (مقدمة): ইসলাম সহজতার ধর্ম, কিন্তু এই সহজতার নামে শরীয়তের গণ্ডি পার হওয়া বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা নিষিদ্ধ। ফতোয়ার জগতে একটি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ হলো 'তাতাব্বু রোখাস' বা মাযহাবগুলোর শিথিল ও সহজ মতগুলো খুঁজে খুঁজে বের করা। উসূলুল ইফতার দৃষ্টিতে এটি একটি গর্হিত অপরাধ।

'তাতাব্বু রোখাস'-এর পরিচয় (تعريف تتبع الرخص): 'তাতাব্বু' অর্থ অন্বেষণ করা বা খুঁজে বেড়ানো। আর 'রোখাস' হলো রুখসত বা সহজতার বহুবচন। পারিভাষিক অর্থে:

"শরয়ী কোনো দলিল বা জরুরত ছাড়াই কেবল নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন মাযহাবের সহজ ও শিথিল মতগুলো বেছে নেওয়াকে 'তাতাব্বু রোখাস' বলে।"

উদাহরণ: একজন ব্যক্তি শাফেয়ী মাযহাব মতে ওজু করল (যেখানে শরীরের সামান্য অংশ ধোয়া যথেষ্ট), আবার হানাফি মাযহাব মতে স্পর্শের দ্বারা ওজু ভাঙ্গে

না বলে দাবি করল, আবার অন্য মাযহাবের দোহাই দিয়ে মদ পান করল— এই যে সুবিধামতো মত পাল্টানো, এটাই তাতাব্বু রোখাস।

মুফতির জন্য এর বিধান (حكمه للمفتي): অধিকাংশ ফকিহ ও মুহাদ্দিসিনে কেরামের ঐকমত্যে (ইজমা), মুফতির জন্য 'তাতাব্বু রোখাস' বা সুবিধাবাদ নীতি গ্রহণ করা **হারাম এবং নাজায়েজ**। ইমাম সুলাইমান আত-তাইমী (রহ.) বলেন:

"যে ব্যক্তি আলেমদের ভুল বা শিথিল মতগুলো (স্খলন) গ্রহণ করে বেড়ায়, সে সমস্ত খারাপি নিজের মধ্যে জমা করল।" অন্য বর্ণনায় এসেছে: **" من تتبع رخص المذاهب فقد تزندق"** (যে ব্যক্তি মাযহাবগুলোর সুযোগ বা ছাড়গুলো খুঁজে বেড়ায়, সে জিন্দিক বা ধর্মত্যাগী হওয়ার উপক্রম হয়)।

অবৈধ হওয়ার কারণসমূহ (أسباب التحريم): ১. **প্রবৃত্তির অনুসরণ:** এটি আল্লাহর হুকুম মানা নয়, বরং নিজের নফস বা ইচ্ছার পূজা করা। ২. **শরীয়তের খেল-তামাশা:** এর মাধ্যমে শরীয়তকে একটি খেলনার বস্তুতে পরিণত করা হয়। যখন যা খুশি মানলাম, আর যা খুশি মানলাম না— এটা দ্বীনদারী নয়। ৩. **তালফিক (মিশ্রণ):** এর ফলে অনেক সময় 'তালফিক' সৃষ্টি হয়, যা সকল মাযহাবেই বাতিল। অর্থাৎ এমন এক নতুন পদ্ধতি তৈরি হয়, যা কোনো ইমামই বৈধ বলেননি।

কখন বৈধ হতে পারে? (ক্ষেত্রবিশেষে রুখসত গ্রহণ): মুফতির জন্য ঢালাওভাবে 'তাতাব্বু রোখাস' জায়েজ নেই, তবে বিশেষ প্রয়োজনে 'তাতাব্বু' না করে শরীয়তসম্মত উপায়ে সহজ মত গ্রহণ করা বৈধ, একে **'তাওাসসু' বা প্রশস্ততা** বলা হয়। এর শর্ত হলো: ১. **জরুরত বা হাজত:** মানুষ কোনো কঠিন বিপদে পড়লে। ২. **দলিলভিত্তিক:** মুফতি কেবল সহজ করার জন্য নয়, বরং দলিলের ভিত্তিতে অন্য মাযহাবের বা নিজের মাযহাবের দুর্বল মত গ্রহণ করতে পারেন (যেমন— আধুনিক যুগে হানাফি মুফতিগণ নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রীর ক্ষেত্রে মালিকি মাযহাবের ফতোয়া দেন)। ৩. **শরীয়তের উদ্দেশ্য রক্ষা:** উদ্দেশ্য হতে হবে দ্বীন পালনকে সহজ করা, দ্বীন ত্যাগ করা নয়।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, মুফতি হবেন একজন দক্ষ চিকিৎসকের মতো। তিনি রোগীকে প্রয়োজন অনুযায়ী তিতা ওষুধও দেবেন, আবার অবস্থা বুঝে সহজ পথ্যও দেবেন। কিন্তু কেবল রোগীর খুশির জন্য সব মাযহাবের সহজ

মত একত্র করে 'তাতাব্বু রোখাস' করা স্পষ্ট হারাম। এটি মানুষকে আল্লাহমুখী না করে সুবিধাবাদী বানায়।

প্রশ্ন-১৯: যে সকল মাসআলায় মাযহাবগুলোর মধ্যে তীব্র মতভেদ থাকে, মুফতী সেগুলো কীভাবে সমাধান করবেন?
(كيف يتعامل المفتي مع القضايا التي تشتد فيها الخلافات بين المذاهب؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি ফিকহশাস্ত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের মতভেদ (ইখতিলাফ) উম্মাহর জন্য রহমতস্বরূপ। তবে একজন মুফতির জন্য ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে এই মতভেদপূর্ণ মাসায়েল সমাধান করা বেশ জটিল। বিশেষ করে যখন মাযহাবগুলোর মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয়, তখন মুফতিকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং সুনির্দিষ্ট মূলনীতি অনুসরণ করে সমাধান দিতে হয়।

তীব্র মতভেদপূর্ণ বিষয়ে মুফতির করণীয় ও সমাধান পদ্ধতি: হানাফি উসুল ও 'আদাবুল মুফতি' অনুযায়ী মুফতিকে নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়:

১. নিজ মাযহাবের ওপর অটল থাকা (الالتزام بالمذهب): হানাফি মুফতির জন্য সাধারণ অবস্থায় অন্য মাযহাবের মত গ্রহণ করা জায়েজ নেই, যদিও অন্য মাযহাবের দলিল শক্তিশালী মনে হয়। কারণ মুফতি মুজতাহিদ নন, তিনি মুকাল্লিদ।

- **নিয়ম:** তাকে সর্বাবস্থায় হানাফি মাযহাবের **'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'** বা নির্ভরযোগ্য মতের ওপর ফতোয়া দিতে হবে। মাযহাবের ইমামগণের মতভেদ থাকলে 'মুফতা বিহি' (যার ওপর ফতোয়া প্রদত্ত) কওলের ওপর আমল করতে হবে।

২. দলিলের শক্তি যাচাই না করা (عدم النظر في الدليل للمقلد): তীব্র মতভেদের সময় মুফতি যদি মনে করেন যে, শাফেয়ী মাযহাবের দলিল শক্তিশালী, তবুও তিনি মাযহাব ত্যাগ করতে পারবেন না। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) বলেন, "মুকাল্লিদের জন্য তার ইমামের উক্তিই হলো দলিল।" কারণ মুফতির দলিল বোঝার বুঝ (ফাহাম) ভুল হতে পারে, কিন্তু ইমামের ইজতেহাদ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

৩. জরুরত বা তীব্র প্রয়োজনে মাযহাব ত্যাগ (العدول عند الضرورة): যদি মতভেদপূর্ণ মাসআলায় হানাফি মাযহাবের ওপর আমল করা মানুষের জন্য অসম্ভব বা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায় (যাকে 'জরুরত' বা 'উমুমে বালওয়া' বলা হয়), তবে মুফতি অন্য মাযহাবের সমাধান গ্রহণ করতে পারেন।

- **শর্তাবলি:**
    - ব্যক্তিগত ইচ্ছায় নয়, বরং বিজ্ঞ আলেমদের পরামর্শে হতে হবে।
    - অন্য মাযহাবের শর্তগুলো পূর্ণ করতে হবে।
    - 'তালফিক' (দুই মাযহাবের মিশ্রণ যা উভয় মাযহাবে বাতিল) করা যাবে না।
- **উদাহরণ:** স্বামী নিরুদ্দেশ হলে হানাফি মাযহাবে স্ত্রীর অপেক্ষা করার সময়সীমা অনেক দীর্ঘ (৭০-৯০ বছর)। কিন্তু আধুনিক যুগে এটি নারীদের জন্য তীব্র কষ্টের কারণ। তাই ওলামায়ে কেরাম মালেকি মাযহাবের মত গ্রহণ করে ৪ বছর অপেক্ষার ফতোয়া দিয়েছেন। এটি মতভেদ সমাধানের একটি প্রাজ্ঞ পদ্ধতি।

৪. খুরুজ মিনাল খিলাফ (الخروج من الخلاف): মুফতি ফতোয়া দেওয়ার সময় এমন পথ বেছে নেবেন, যাতে সব মাযহাবের মতে আমলটি সহিহ হয়। এটি মুস্তাহাব বা উত্তম পদ্ধতি।

- **উদাহরণ:** ওজুতে শরীরের এক-চতুর্থাংশ মাথা মাসেহ করা হানাফি মতে ফরজ, কিন্তু পুরো মাথা মাসেহ করা শাফেয়ী মতে উত্তম এবং মালেকি মতে ফরজ। এক্ষেত্রে মুফতি ফতোয়া দেবেন পুরো মাথা মাসেহ করার জন্য, যাতে কারো মতেই ওজু বাতিল না হয়।

৫. বিবাদ নিরসনে বিচারকের রায় (حكم الحاكم يرفع الخلاف): সামাজিক বিবাদ বা তীব্র মতভেদপূর্ণ বিষয়ে যদি আদালত বা কাজি কোনো একটি মতের পক্ষে রায় দেন, তবে মুফতি সেই রায়ের আলোকেই ফতোয়া দেবেন। কারণ ফিকহী মূলনীতি হলো: **"حكم الحاكم يرفع الخلاف"** (বিচারকের রায় মতভেদ দূর করে দেয়)।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, মতভেদপূর্ণ বিষয়ে মুফতি প্রবৃত্তি বা আবেগের অনুসরণ করবেন না। তিনি প্রথমে নিজ মাযহাবের ওপর ভিত্তি করে সমাধান দেবেন। যদি উম্মাহর স্বার্থে বা কঠিন প্রয়োজনে অন্য মত গ্রহণের দরকার হয়, তবে তা শরিয়তের মূলনীতি মেনেই করবেন। এর মাধ্যমে উম্মাহর ঐক্য ও শরিয়তের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

প্রশ্ন-২০: কোন নিয়মনীতিগুলো মুফতীকে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোরতা বা অতিরিক্ত শিথিলতা থেকে বাধা দেয়?

(ما هي الضوابط التي تمنع المفتي من التشدد أو التساهل المفرط في الإفتاء؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলাম একটি মধ্যপন্থী ধর্ম (দ্বীনে ওয়াসাত)। ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুফতিকে অতিরিক্ত কঠোরতা (ইফরাত) এবং অতিরিক্ত শিথিলতা (তাফরিত) পরিহার করতে হয়। মুফতি যেন এই দুই প্রান্তিকতার শিকার না হন, সেজন্য ফিকহ ও উসূলুল ইফতায় কিছু রক্ষা কবচ বা নিয়মনীতি (দাওয়াবিত) নির্ধারণ করা হয়েছে।

অতিরিক্ত কঠোরতা ও শিথিলতা রোধকারী নিয়মনীতিসমূহ:

১. 'তাতাব্বু রোখাস' বর্জন করা (اجتناب تتبع الرخص): শিথিলতা রোধের প্রধান নীতি হলো 'তাতাব্বু রোখাস' বা মাযহাবগুলোর সহজ মত খুঁজে বেড়ানো হারাম। মুফতি যদি মানুষের মন যোগানোর জন্য কেবল সহজ মত খোঁজেন, তবে তিনি দ্বীনকে নষ্ট করবেন।

- **নীতিমালা:** মুফতিকে অবশ্যই মাযহাবের নির্ভরযোগ্য (রাজীহ) মতের ওপর ফতোয়া দিতে হবে, চাই তা কঠিন হোক বা সহজ। প্রবৃত্তির অনুসরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

২. 'আসির' বা কাঠিন্য পরিহার করা (رفع العسر والحرج): অতিরিক্ত কঠোরতা রোধের জন্য শরিয়তের মূলনীতি হলো— "দ্বীন সহজ"। মুফতি অকারণে মানুষের ওপর এমন ফতোয়া চাপিয়ে দেবেন না, যা পালন করা তাদের সাধ্যের বাইরে।

- **নীতিমালা:** যদি কোনো মাসআলায় দুটি গ্রহণযোগ্য মত থাকে, তবে মুফতি মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে অপেক্ষাকৃত সহজ মতটি গ্রহণ

করবেন, যাতে মানুষ দ্বীন পালনে উৎসাহী হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না।"

৩. 'মুফতা বিহি' কওলের অনুসরণ (الالتزام بالقول المفتى به): মুফতিকে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি মতো ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য মাযহাবে 'মুফতা বিহি' (ফতোয়াযোগ্য) মত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

- **কার্যকারিতা:** মুফতি চাইলেই কঠোর হতে পারেন না, আবার চাইলেই শিথিল হতে পারেন না। তাকে দেখতে হয় ইমামগণ কোন মতের ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। এই নীতি মুফতিকে একটি সুশৃঙ্খল কাঠামোর মধ্যে রাখে।

৪. উরফ ও যামানার বিবেচনা (مراعاة العرف والزمان): মুফতি যদি যুগের পরিবর্তন অস্বীকার করে পুরাতন কিতাবের সব হুকুম হুবহু প্রয়োগ করেন, তবে তা হবে অতিরিক্ত কঠোরতা। আবার সব আধুনিকতাকে মেনে নিলে তা হবে অতিরিক্ত শিথিলতা।

- **সামঞ্জস্য:** মুফতিকে দেখতে হবে কোন প্রথাটি শরিয়ত বিরোধী (তা বর্জনীয়) আর কোনটি শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয় (তা গ্রহণীয়)। এই ভারসাম্য মুফতিকে মধ্যপন্থী রাখে।

৫. দলিল ও নস-এর আনুগত্য (الالتزام بالنص): শিথিলতা রোধের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধানের (নস) সামনে আত্মসমর্পণ। মুফতি যুক্তির দোহাই দিয়ে সুদের মতো হারাম বিষয়কে হালাল করতে পারেন না। নস-এর উপস্থিতি মুফতির কলমকে সংযত রাখে।

৬. তাকওয়া ও আখেরাতের ভয় (التقوى): সবশেষে, মুফতির হৃদয়ে আল্লাহর ভয় তাকে কঠোরতা ও শিথিলতা উভয় থেকেই বাঁচায়। তিনি জানেন যে, ভুল ফতোয়া দিলে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তাই তিনি সতর্ক থাকেন।

উপসংহার (خاتمة): মুফতি হলেন "সিরাতাল মুস্তাকিম"-এর পথপ্রদর্শক। উল্লিখিত নীতিমালাগুলো মুফতিকে রাস্তার দুই পাশের খাদ (অতিরিক্ত কঠোরতা ও শিথিলতা) থেকে রক্ষা করে মধ্যম পন্থায় অবিচল রাখে। এই ভারসাম্য বজায় রাখাই একজন দক্ষ মুফতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মুজতাহিদদের স্তর ও হানাফী ফকীহগণ

প্রশ্ন-২১: হানাফীদের নিকট 'মুজতাহিদগণের স্তরসমূহ' বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর এবং প্রতিটি স্তরের প্রধান উদাহরণ দাও।

اذكر "طبقات المجتهدين" عند الحنفية بالتفصيل مع ذكر أبرز مثال لكل طبقة.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি ফিকহ ও ফতোয়া শাস্ত্রে সকল ফকিহ বা আলেমের মর্যাদা সমান নয়। ইলমি যোগ্যতা ও ইজতেহাদের ক্ষমতার ভিত্তিতে তাঁদেরকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়েছে। হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে কামাল পাশা (রহ.) ফকিহগণকে **সাতটি স্তরে (Tabaqat)** বিভক্ত করেছেন। সঠিক ফতোয়া প্রদানের জন্য এই স্তরগুলো জানা মুফতির জন্য অপরিহার্য।

হানাফী মাযহাবে মুজতাহিদগণের সাতটি স্তর:

১. শরীয়তের মুজতাহিদ বা মুজতাহিদে মুতলাক (مجتهد في الشرع): এরা হলেন ফিকহের সর্বোচ্চ স্তরের ইমাম। তাঁরা সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে উসুল (মূলনীতি) এবং ফুরু (শাখা মাসআলা) বের করতে সক্ষম। তাঁরা কারো তাকলিদ বা অনুসরণ করেন না।

- **উদাহরণ:** ইমামুল আজম আবূ হানীফা (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)।

২. মাযহাবের মুজতাহিদ বা মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (مجتهد في المذهب): এরা উসুল বা মূলনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের ইমামের (যেমন আবু হানিফার) অনুসরণ করেন, কিন্তু ফুরু বা শাখা মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে ইজতেহাদ করার যোগ্যতা রাখেন। তাঁরা দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কোনো কোনো মাসআলায় ইমামের সাথে দ্বিমতও পোষণ করতে পারেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (রহ.)।

৩. মাসায়েলের মুজতাহিদ বা মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল (مجتهد في المسائل): এরা সেই সকল মাসআলায় ইজতেহাদ করেন, যেগুলোর ব্যাপারে মাযহাবের

ইমাম থেকে কোনো স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় না। তবে তাঁরা ইমামের উসুল ও ফুরুর বিরোধিতা করেন না।

- **উদাহরণ:** ইমাম খাসসাফ (রহ.), ইমাম ত্বহাবী (রহ.), ইমাম কারখী (রহ.), শামসুল আইম্মাহ আল-হালওয়ানী (রহ.)।

৪. আসহাবুত তাখরীজ (أصحاب التخريج): এরা ইজতেহাদ করতে পারেন না, কিন্তু তাঁরা ইমামের কোনো অস্পষ্ট উক্তিকে ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং উসুলের ওপর ভিত্তি করে (কিয়াস করে) সদৃশ মাসআলার সমাধান দিতে পারেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম জাসসাস আর-রাযী (রহ.)।

৫. আসহাবুত তারজীহ (أصحاب الترجيح): এরা মাযহাবের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য থেকে শক্তিশালী মতটি বাছাই করার যোগ্যতা রাখেন। তাঁরা বলেন, "এই মতটি ওই মতের চেয়ে উত্তম" বা "এটাই সহিহ"।

- **উদাহরণ:** আবুল হাসান আল-কুদূরী (রহ.) (কুদূরী প্রণেতা), বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী (রহ.) (হেদায়া প্রণেতা)।

৬. আসহাবুত তাময়ীজ (أصحاب التمييز): এরা মাযহাবের সবল, দুর্বল, যাহিরুর রিওয়ায়াহ এবং নাওয়াদির— এই বর্ণনাগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। তাঁরা কিতাব রচনার সময় বাতিল বা দুর্বল মত বাদ দিয়ে নির্ভরযোগ্য মত উল্লেখ করেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ আন-নাসাফী (রহ.) (কানযুদ দাকায়েক প্রণেতা), আল্লামা আইনী (রহ.)।

৭. মুকাল্লিদ মাহাদ (المقلد المحض): এরা ওপরের কোনো কাজের যোগ্যতা রাখেন না। এরা কেবল পূর্ববর্তী ইমামদের কিতাব বুঝে পড়েন এবং সেই অনুযায়ী ফতোয়া দেন। এদের কাজ হলো কিতাব থেকে সঠিক ইবারত নকল করা।

- **উদাহরণ:** পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলেম এবং বর্তমান সময়ের মুফতিগণ এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার (خاتمة): ফকিহগণের এই স্তরবিন্যাস ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুফতি যখন কোনো মাসআলায় একাধিক মত পান, তখন

তিনি দেখেন কোন স্তরের ফকিহ কোন মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ওপরের স্তরের ফকিহের মত নিচের স্তরের ফকিহের মতের চেয়ে অগ্রাধিকার পায়। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) তাঁর 'শরহু উকুদি রসমিল মুফতি' কিতাবে এই স্তরবিন্যাসকে ফতোয়ার ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন-২২: হানাফী পরিভাষায় 'মুজতাহিদুল মাযহাব' ও 'মুজতাহিদুল মাসায়েল'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(ما الفرق بين "مجتهد المذهب" و"مجتهد المسائل" في الاصطلاح الحنفي؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি ফিকহশাস্ত্রে ফকিহগণের যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্তর বা 'তাকাবাত' নির্ণয় করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে কামাল পাশা (রহ.) হানাফি ফকিহগণকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় স্তর হলো 'মুজতাহিদুল মাযহাব' এবং তৃতীয় স্তর হলো 'মুজতাহিদুল মাসায়েল'। ফতোয়া প্রদান ও তারজিহ (প্রাধান্য) দেওয়ার ক্ষেত্রে এই দুই স্তরের পার্থক্য জানা অত্যন্ত জরুরি।

১. মুজতাহিদুল মাযহাব-এর পরিচয় (تعريف مجتهد المذهب): হানাফি পরিভাষায় 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' বা মাযহাবের মুজতাহিদ হলেন তাঁরা, যাঁরা উসুল বা মূলনীতির ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অনুসরণ করেন, কিন্তু ফুরু বা শাখা-প্রশাখা মাসায়েলের ক্ষেত্রে নিজস্ব ইজতেহাদের মাধ্যমে দলিল দিয়ে ইমামের সাথে দ্বিমত পোষণ করার যোগ্যতা রাখেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এবং ইমাম জুফার (রহ.)।

২. মুজতাহিদুল মাসায়েল-এর পরিচয় (تعريف مجتهد المسائل): 'মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল' হলেন তাঁরা, যাঁরা উসুল (মূলনীতি) এবং ফুরু (শাখা মাসায়েল)—উভয় ক্ষেত্রেই মাযহাবের ইমামের অনুসরণ করেন। তাঁরা ইমামের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন না। তবে যেসব নতুন সমস্যা (Nawazil) বা মাসআলা সম্পর্কে ইমাম থেকে কোনো স্পষ্ট উক্তি (Nass) পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা ইমামের উসুলের আলোকে ইজতেহাদ করে সমাধান বের করেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম খাসসাফ, ইমাম ত্বহাবী, ইমাম কারখী, শামসুল আইম্মাহ হালওয়ানী (রহ.)।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য (الفروق بينهما): এই দুই স্তরের মুজতাহিদগণের মধ্যে সূক্ষ্ম কিন্তু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। নিচে ছক আকারে তা উপস্থাপন করা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	মুজতাহিদুল মাযহাব (مجتهد المذهب)	মুজতাহিদুল মাসায়েল (مجتهد المسائل)
১. ইজতেহাদের পরিসর	এদের ইজতেহাদের পরিসর ব্যাপক। এরা ইমামের প্রতিষ্ঠিত মাসআলাতেও দ্বিমত করতে পারেন।	এদের ইজতেহাদ কেবল ওই সব মাসআলায় সীমাবদ্ধ, যেগুলোর ব্যাপারে ইমামের কোনো স্পষ্ট উক্তি নেই।
২. ইমামের সাথে বিরোধিতা	এরা দলিলের ভিত্তিতে ইমামের ফতোয়ার বিরোধিতা বা দ্বিমত পোষণ করার ক্ষমতা রাখেন।	এরা উসুল বা ফুরু— কোনোটিতেই ইমামের বিরোধিতা করেন না। এরা ইমামের অনুগত থাকেন।
৩. মূলনীতি (উসুল) অনুসরণ	এরা ইমামের তৈরি করা উসুল মেনে চলেন, নিজস্ব উসুল তৈরি করেন না।	এরাও ইমামের উসুল মেনে চলেন এবং সেই উসুলের আলোকেই নতুন সমাধান বের করেন।
৪. স্তরের মর্যাদা	এটি ইবনে কামাল পাশার শ্রেণিবিন্যাসে **দ্বিতীয় স্তর**। এরা মর্যাদায় অনেক ঊর্ধ্বে।	এটি ইবনে কামাল পাশার শ্রেণিবিন্যাসে **তৃতীয় স্তর**।
৫. ফতোয়ায় প্রাধান্য	মতভেদের সময় এদের মতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় এবং কখনো কখনো ইমামের মতের ওপর এদের মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় (যেমন- ইমাম আবু ইউসুফের বিচারিক রায়)।	ইমামের মত বা মুজতাহিদুল মাযহাবের মতের বিপরীতে এদের নিজস্ব মত গ্রহণযোগ্য হয় না।

পার্থক্যের ফলাফল (آثار الفرق): ১. ফতোয়া চয়ন: যদি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মধ্যে মতভেদ হয়, তবে মুফতি

বিচার-বিশ্লেষণ করে ইমাম আবু ইউসুফের মত গ্রহণ করতে পারেন। কারণ তিনি মুজতাহিদুল মাযহাব। ২. **নতুন মাসআলা:** কিন্তু যদি ইমাম ত্বহাবী (রহ.) এমন কোনো মত দেন যা পূর্ববর্তী ইমামদের মতের বিরোধী, তবে হানাফি মাযহাবে তা 'শায' বা বিরল হিসেবে গণ্য হবে। কারণ মুজতাহিদুল মাসায়েলের কাজ বিরোধিতা করা নয়, বরং অস্পষ্ট বিষয় স্পষ্ট করা।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, মুজতাহিদুল মাযহাব হলেন ইমামের সহযোগী কিন্তু স্বাধীন চিন্তার অধিকারী (শাখা-প্রশাখায়)। আর মুজতাহিদুল মাসায়েল হলেন ইমামের পূর্ণ অনুসারী গবেষক, যিনি কেবল নতুন ঘটনার সমাধানে ইজতেহাদ করেন। ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুজতাহিদুল মাযহাবের রায় মুজতাহিদুল মাসায়েলের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

প্রশ্ন-২৩: মুজতাহিদুল মাযহাব স্তরের উক্তিগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কীভাবে নির্ভরযোগ্য উক্তিটি নির্ধারণ করা হয়?

(كيف يتم تحديد القول المعتمد عند تعارض الأقوال في طبقة مجتهدي المذهب؟)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি মাযহাবে 'মুজতাহিদুল মাযহাব' বা দ্বিতীয় স্তরের ইমামগণ হলেন মূলত ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.), যাঁদেরকে একত্রে 'সাহিবাইন' বলা হয়। অনেক সময় কোনো মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে তাঁদের মতভেদ হয়, আবার কখনো সাহিবাইন নিজেদের মধ্যেও মতভেদ করেন। এমতাবস্থায় মুফতি কোন মতটি গ্রহণ করবেন, তার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি বা 'কাওয়ায়েদুত তারজিহ' রয়েছে।

নির্ভরযোগ্য উক্তি নির্ধারণের পদ্ধতি (طريقة الترجيح):

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতের অগ্রাধিকার (تقديم قول الإمام): হানাফি মাযহাবের সাধারণ মূলনীতি হলো, সর্বাবস্থায় ইমামুল আজম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া। কারণ তিনি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইজতেহাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান।

- **নীতিমালা:** যদি সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) ইমামের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, তবুও সাধারণ অবস্থায় ইমামের মতই

গ্রহণযোগ্য বা 'মুফতা বিহি'। তবে যদি ইমামের মতের দলিল দুর্বল প্রমাণিত হয় (যা বিরল) অথবা যুগের পরিবর্তনের কারণে সাহিবাইনের মত অধিক উপযোগী হয়, তবে ভিন্ন কথা।

২. সাহিবাইনের ঐকমত্য (اتفاق الصاحبين): যদি কোনো মাসআলায় ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) একমত হন এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ভিন্ন মত পোষণ করেন, সেক্ষেত্রে মুফতিদের মধ্যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে:

- কিছু ফকিহ বলেন, সাহিবাইনের মত গ্রহণ করা উচিত, কারণ দুইজন মুজতাহিদের রায় একজনের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে।
- তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো, এরপরও ইমাম আবু হানিফার মতই প্রাধান্য পাবে, যতক্ষণ না সাহিবাইনের পক্ষে শক্তিশালী 'জরুরত' বা দলিল পাওয়া যায়।

৩. সাহিবাইনের মধ্যে মতবিরোধ হলে করণীয় (الخلاف بين الصاحبين): যদি ইমাম আবু হানিফার কোনো স্পষ্ট মত না থাকে, অথবা সাহিবাইন নিজেদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত দেন, তখন মুফতি নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণ করবেন:

- **ক. বিচার ও সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিষয় (القضاء والشهادات):** বিচার ব্যবস্থা, কাজির রায় এবং সাক্ষ্য আইনের ক্ষেত্রে **ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)**-এর মত প্রাধান্য পাবে।
    - *কারণ:* তিনি দীর্ঘকাল আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান বিচারপতি (কাজি উল কুজ্জাত) ছিলেন। বিচারিক অভিজ্ঞতা তাঁর বেশি ছিল এবং তিনি মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন।
- **খ. মিরাস ও আত্মীয়তার বিষয় (الميراث وذوي الأرحام):** উত্তরাধিকার বণ্টন এবং যাবিউল আরহামের (রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়) মাসায়েলের ক্ষেত্রে **ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)**-এর মত প্রাধান্য পাবে।
    - *কারণ:* তিনি এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য রাখতেন এবং সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশে পারদর্শী ছিলেন।
- **গ. অন্যান্য বিষয় (ইবাদত ও মুআমালাত):** অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে মুফতি দেখবেন মাযহাবের পরবর্তী বড় ফকিহগণ (মাশায়েখ) কার

মতকে শক্তিশালী বা 'সহিহ' বলেছেন। যদি কোনো তারজিহ না থাকে, তবে মুফতি দলিলের ভিত্তিতে যার মত শক্তিশালী মনে করবেন, তা গ্রহণ করবেন।

৪. যুগের পরিবর্তন ও উরফের প্রভাব (تغير الزمان): অনেক ক্ষেত্রে সাহিবাইনের মতভেদ দলিলের ভিত্তিতে নয়, বরং তৎকালীন সময় ও পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে ছিল।

- *উদাহরণ:* কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া। ইমাম আবু হানিফা নিষেধ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে সাহিবাইন বা পরবর্তী ফকিহগণ তা জায়েজ বলেছেন। এক্ষেত্রে মুফতি যুগের প্রয়োজনে সাহিবাইন বা পরবর্তী ফকিহদের মত গ্রহণ করবেন। একে বলা হয়— *"মতভেদটি যামানার, দলিলের নয়।"*

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, মুজতাহিদুল মাযহাব স্তরে মতভেদ দেখা দিলে মুফতি অন্ধভাবে কাউকে অনুসরণ করবেন না। তিনি প্রথমে ইমাম আবু হানিফার মত খুঁজবেন। এরপর বিষয়ভেদে (বিচারিক বা মিরাস) ইমাম আবু ইউসুফ বা ইমাম মুহাম্মদের মত গ্রহণ করবেন। এবং সর্বক্ষেত্রে 'মুফতা বিহি' (যার ওপর ফতোয়া প্রদত্ত) কওলটি খুঁজে বের করবেন।

প্রশ্ন-২৪: হানাফী মাসয়ালাসমূহের তিনটি মৌলিক স্তর কী কী? এগুলো সংক্ষেপে স্পষ্ট কর।

(ما هي "طبقات مسائل الأحناف" الثلاثة الأساسية؟ وضحها بإيجاز.)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি ফিকহের সুবিশাল ভাণ্ডারে হাজার হাজার মাসআলা রয়েছে। সব মাসআলার মান বা গ্রহণযোগ্যতা সমান নয়। ফতোয়া প্রদানের সময় মুফতি যেন বিভ্রান্ত না হন, সেজন্য ফকিহগণ হানাফি মাসআলাগুলোকে বর্ণনার শক্তি ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে তিনটি প্রধান স্তরে (Tabaqat) বিভক্ত করেছেন। 'শরহু উকুদি রসমিল মুফতি' কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

হানাফি মাসয়ালাসমূহের তিনটি মৌলিক স্তর (طبقات المسائل):

১. যাহিরুর রিওয়ায়াহ বা উসুলুল মাসায়েল (ظاهر الرواية أو أصول المسائل): এটি হানাফি মাযহাবের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

- **পরিচয়:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে যেসব মাসআলা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী সনদে (মুতাওয়াতির বা মাশহুর সনদে) বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলা হয়। এগুলোকে 'উসুলুল মাসায়েল'ও বলা হয় কারণ এগুলোই মাযহাবের মূল ভিত্তি।
- **সংকলন:** এই মাসআলাগুলো মূলত ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর ৬টি প্রসিদ্ধ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (কিতাবগুলোর নাম পরবর্তী প্রশ্নে আসছে)।
- **বিধান:** মুফতির জন্য সর্বপ্রথম এই স্তরের মাসআলা গ্রহণ করা ওয়াজিব। এর বিপরীতে অন্য কোনো বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

২. মাসায়েলে নাওয়াদির বা গায়ের যাহিরুর রিওয়ায়াহ (مسائل النوادر أو غير ظاهر الرواية): এটি দ্বিতীয় স্তর।

- **পরিচয়:** এই মাসআলাগুলোও ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর ছাত্রদের থেকে বর্ণিত, কিন্তু এগুলো 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর কিতাবগুলোতে নেই অথবা থাকলেও সনদটি অতটা শক্তিশালী নয়। এগুলো ইমাম মুহাম্মদের অন্যান্য কিতাবে (যেমন— কিসানিয়্যাত, হারুনিয়্যাত) অথবা ইমাম আবু ইউসুফের 'আমালি' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।
- **নামকরণ:** 'নাওয়াদির' অর্থ বিরল বা দুর্লভ। যেহেতু এগুলো সচরাচর বর্ণিত হয় না বা সনদের দিক থেকে একক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এসেছে, তাই এ নাম দেওয়া হয়েছে।
- **বিধান:** যদি যাহিরুর রিওয়ায়াতে কোনো মাসআলার সমাধান না পাওয়া যায়, তবেই কেবল এই স্তরের মাসআলা গ্রহণ করা যাবে। তবে শর্ত হলো, মাশায়েখগণ এটাকে গ্রহণ করার পক্ষে মত দিতে হবে।

৩. মাসায়েলে ওয়াকিয়াত বা ফতোয়া (مسائل الواقعات أو الفتاوى): এটি তৃতীয় স্তর।

- **পরিচয়:** এগুলো এমন মাসআলা, যা সরাসরি ইমাম আবু হানিফা বা সাহিবাইন থেকে বর্ণিত নয়। বরং পরবর্তী যুগের মুজতাহিদ ফকিহগণ (যেমন— ইমাম খাসসাফ, ইমাম তাহাবী, ইমাম কারখী) নতুন সৃষ্ট সমস্যার (Nawazil) সমাধানে ইমামদের উসূলের আলোকে ইজতেহাদ করে বের করেছেন।

- **নামকরণ:** 'ওয়াকিয়াত' অর্থ সংঘটিত ঘটনাবলি। যেহেতু নতুন নতুন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই মাসআলাগুলো উদ্ভূত হয়েছে, তাই একে ওয়াকিয়াত বা নাওয়াজিল বলা হয়।

- **সংকলন:** এই ফতোয়াগুলো 'ফতোয়ায়ে কাজিখান', 'ফতোয়ায়ে বাজ্জাজিয়া', 'মুহিত' ইত্যাদি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। হিদায়া ও কুদুরী গ্রন্থেও এর অনেক মাসআলা পাওয়া যায়।

- **বিধান:** প্রথম দুই স্তরে সমাধান না পাওয়া গেলে মুফতি এই স্তরের ওপর নির্ভর করবেন।

উপসংহার (خاتمة): হানাফি মাযহাবের মাসআলার এই স্তরবিন্যাস ফতোয়া শাস্ত্রের মেরুদণ্ড। একজন মুফতি যখন কোনো ফতোয়া দেন, তখন তাঁকে এই ক্রমধারা (১ > ২ > ৩) বজায় রাখতে হয়। যাহিরুর রিওয়ায়াহ থাকতে নাওয়াদির বা ফতোয়ার ওপর আমল করা উসূলের পরিপন্থী।

প্রশ্ন-২৫: 'যাহিরুর রিওয়ায়া'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এ মাসয়ালাগুলো সংকলনকারী প্রধান কিতাবসমূহ কী কী?

(عرف "ظاهر الرواية" وما هي أهم الكتب التي جمعت هذه المسائل؟)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি মাযহাবের মাসআলাগুলোর মধ্যে 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' হলো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য অংশ। এটি মাযহাবের ভিত্তিপ্রস্তর। মাযহাবের সঠিক মত জানতে হলে যাহিরুর রিওয়ায়াহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অপরিহার্য। এই মাসআলাগুলো ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (রহ.) অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সংকলন করেছেন।

'যাহিরুর রিওয়ায়া'-এর সংজ্ঞা (تعريف ظاهر الرواية): ১. শাব্দিক অর্থ: 'যাহির' (ظاهر) অর্থ স্পষ্ট বা প্রকাশ্য। আর 'রিওয়ায়াহ' (رواية) অর্থ বর্ণনা। অর্থাৎ সুস্পষ্ট বর্ণনা। **২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর সেই সকল মতামত বা মাসআলা, যা ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তাঁর নির্ভরযোগ্য ছয়টি কিতাবে মুতাওয়াতির (ধারাবাহিক) বা মাশহুর (প্রসিদ্ধ) সনদে বর্ণনা করেছেন, তাকে যাহিরুর রিওয়ায়াহ বলা হয়।" কখনো কখনো এতে ইমাম জুফার (রহ.) ও ইমাম হাসান ইবনে জিয়াদ (রহ.)-এর মতও অন্তর্ভুক্ত থাকে। একে 'মাসায়েলুল উসুল' (মূল মাসআলা)-ও বলা হয়।

কেন 'যাহিরুর রিওয়ায়া' বলা হয়? কারণ এই মাসআলাগুলো ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে এমন শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এগুলো তাঁদের (ইমামদের) উক্তি হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা অস্পষ্টতা নেই। এটি হানাফি মাযহাবের "Official Ruling" বা দাপ্তরিক সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য।

সংকলনকারী প্রধান কিতাবসমূহ (الكتب الستة): ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর রচিত ৬টি (মতান্তরে ৫টি) কিতাবকে 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর উৎস বা 'কুতুবুল উসুল' বলা হয়। এগুলো হলো:

১. **আল-মাবসুত (المبسوط):** এটি 'কিতাবুল আসল' নামেও পরিচিত। এতে ইমাম আবু হানিফার ফিকহী মাসআলাগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ২. **আল-জামে আস-সগির (الجامع الصغير):** এই কিতাবটি ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর কাছে পেশ করেছিলেন এবং তিনি এর প্রশংসা করেছিলেন। এতে ১,৫৩২টি মাসআলা রয়েছে। ৩. **আল-জামে আল-কাবির (الجامع الكبير):** এটি ফিকহী মাসআলার এক বিশাল ভাণ্ডার। এতে মাসআলার দলিল ও যুক্তিগুলো বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ৪. **আয-যিয়াদাত (الزيادات):** 'জামে কাবির' লেখার পর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) আরো কিছু মাসআলা সংযোজন করে এই কিতাবটি রচনা করেন। ৫. **আস-সিয়ার আস-সগির (السير الصغير):** এতে জিহাদ, যুদ্ধনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক মাসআলা সংকলিত হয়েছে। ৬. **আস-সিয়ার আল-কাবির (السير الكبير):** এটি ইসলামি আন্তর্জাতিক আইনের ওপর রচিত সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ।

পরবর্তী সংকলন: পরবর্তী যুগে ইমাম হাকিম শহীদ (রহ.) এই ৬টি কিতাবের সারসংক্ষেপ করে **'আল-কাফি' (الكافي)** নামক একটি কিতাব রচনা করেন। পরবর্তীতে শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (রহ.) এই 'কাফি' গ্রন্থের ব্যাখ্যা হিসেবে তাঁর বিখ্যাত **'আল-মাবসুত' (৩০ খণ্ড)** রচনা করেন, যা বর্তমানে হানাফি মাযহাবের যাহিরুর রিওয়ায়াহ জানার সবচেয়ে বড় উৎস।

উপসংহার (خاتمة): ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুফতির জন্য 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' হলো চূড়ান্ত মানদণ্ড। কোনো মাসআলা যদি এই কিতাবগুলোতে পাওয়া যায়, তবে অন্য কোনো কিতাবের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। এগুলো হানাফি মাযহাবের বিশুদ্ধতার প্রতীক।

প্রশ্ন-২৬: 'মাসায়িলুন নাওযাদের' কী? সরাসরি এ মাসায়েল অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া কি সঠিক?

(ما هي "مسائل النوادر"؟ وهل يصح الإفتاء بها مباشرة؟)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি ফিকহের মাসায়েলসমূহকে তাদের বর্ণনার শক্তি ও নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম স্তর হলো 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ', আর দ্বিতীয় স্তর হলো 'মাসায়িলুন নাওয়াদির'। ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে এই স্তরগুলোর পার্থক্য বোঝা এবং কোন স্তর থেকে কখন ফতোয়া দেওয়া যাবে, তা জানা মুফতির জন্য অপরিহার্য। হানাফি উসুল অনুযায়ী নাওয়াদিরের হুকুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'মাসায়িলুন নাওযাদের'-এর পরিচয় (تعريف مسائل النوادر): ১. আভিধানিক অর্থ: 'নাওয়াদির' (النوادر) শব্দটি 'নাদিরা' (نادرة)-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো— বিরল, দুর্লভ বা যা সচরাচর পাওয়া যায় না। **২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফি ফকিহগণের পরিভাষায়:

"যে সকল মাসায়েল ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলো 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর ছয়টি কিতাবে (যেমন—মাবসুত, জামে সগির ইত্যাদি) সংকলিত হয়নি, বরং অন্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে বা একক সনদে এসেছে, সেগুলোকে 'মাসায়িলুন নাওয়াদির' বা 'গায়ের যাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলা হয়।"

সংকলন ও উৎস: এই মাসায়েলগুলো মূলত ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর লেখা 'গায়ের যাহিরুর রিওয়ায়াহ' কিতাবগুলোতে পাওয়া যায়। যেমন:

- **আল-কিসানিয়্যাত (الكيسانيات):** শুয়াইব ইবনে সুলাইমান আল-কিসানি বর্ণিত।
- **আল-হারুনিয়্যাত (الهارونيات):** হারুন আর-রশিদের যামানায় সংকলিত।
- **আল-জুজানিয়্যাত (الجرجانيات):** আলী ইবনে সালিহ আল-জুজানি বর্ণিত।
- **আল-রুকিয়্যাত (الرقيات):** যখন ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) 'রিক্কা' নামক স্থানে বিচারক ছিলেন, তখন যেসব মাসায়েল বর্ণনা করেছিলেন। এছাড়া ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর 'কিতাবুল আমালি' (Dictations)-ও এর অন্তর্ভুক্ত।

সরাসরি ফতোয়া দেওয়ার বিধান (حكم الإفتاء بها مباشرة): নাওয়াদিরের মাসায়েল দিয়ে সরাসরি ফতোয়া দেওয়া সঠিক কি না, এ বিষয়ে হানাফি মাযহাবের মূলনীতি নিম্নরূপ:

১. সাধারণ বিধান (মূলনীতি): সাধারণ অবস্থায় মুফতির জন্য 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা মাযহাবের মূল কিতাবগুলো বাদ দিয়ে 'নাওয়াদির' থেকে ফতোয়া দেওয়া **সঠিক নয় বা জায়েজ নেই**। কারণ যাহিরুর রিওয়ায়াহ হলো মাযহাবের ভিত্তি (আসল), আর নাওয়াদির হলো বিরল বর্ণনা। ভিত্তিকে বাদ দিয়ে বিরল মত গ্রহণ করা মাযহাবের উসুলের পরিপন্থী।

২. শর্তসাপেক্ষে বৈধতা: তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে নাওয়াদির অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া বৈধ হতে পারে, যদি নিম্নলিখিত শর্তগুলো পাওয়া যায়:

- **ক. যাহিরুর রিওয়ায়াতে সমাধান না থাকা:** যদি কোনো সমস্যার সমাধান যাহিরুর রিওয়ায়াহ-এর কিতাবগুলোতে আদৌ না পাওয়া যায়, তখন নাওয়াদির দেখা যাবে।
- **খ. মাশায়েখগণের অনুমোদন (তাসহিহ):** যদি মাযহাবের পরবর্তী যুগের নির্ভরযোগ্য ফকিহগণ (আসহাবুত তারজিহ) কোনো নাওয়াদির

মাসআলাকে 'সহিহ' বা 'ফতোয়াযোগ্য' বলে ঘোষণা করেন। যেমন— ইমাম কুদুরী বা হেদায়া প্রণেতা যদি বলেন, "এই নাওয়াদির মতটিই শক্তিশালী", তবে তার ওপর ফতোয়া দেওয়া যাবে।

- **গ. জরুরত বা প্রয়োজন:** যদি যাহিরুর রিওয়ায়াহর ওপর আমল করা মানুষের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয় এবং নাওয়াদিরের মতটি সহজ ও শরীয়তসম্মত হয়, তবে অভিজ্ঞ মুফতিগণ পরামর্শক্রমে নাওয়াদিরের ওপর ফতোয়া দিতে পারেন।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, 'মাসায়িলুন নাওয়াদির' হানাফি ফিকহের অংশ হলেও তা ফতোয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্তরের। একজন মুফতি সরাসরি এই কিতাবগুলো থেকে ফতোয়া দেবেন না, যতক্ষণ না তিনি নিশ্চিত হন যে যাহিরুর রিওয়ায়াতে এর সমাধান নেই অথবা মাযহাবের বড় ইমামগণ এই বিরল মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রশ্ন-২৭: 'মাসায়িলুল ওয়াকিয়াত' দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ লেখকগণ কারা?

(ما المراد بـ"مسائل الواقعات"؟ ومن هم أشهر المؤلفين فيها؟)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি মাযহাবের মাসায়েল স্তরের তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তর হলো 'মাসায়িলুল ওয়াকিয়াত' (مسائل الواقعات)। একে 'ফতোয়া' (الفتاوى) বা 'নাওয়াজিল' (النوازل)-ও বলা হয়। ফিকহের ক্রমবিকাশে এবং নতুন সমস্যার সমাধানে এই স্তরের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে যখন ইমামগণের সরাসরি উক্তি পাওয়া যায় না, তখন মুফতিরা এই স্তরের ওপর নির্ভর করেন।

১. 'মাসায়িলুল ওয়াকিয়াত'-এর পরিচয় ও উদ্দেশ্য (المراد بمسائل الواقعات):
আভিধানিক অর্থ: 'ওয়াকিয়াত' শব্দটি 'ওয়াকিয়া' (ঘটনা)-এর বহুবচন। আর 'নাওয়াজিল' অর্থ নতুন আপতিত ঘটনা। **২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"যে সকল মাসায়েল ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বা তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্রদের (সাহিবাইন) থেকে বর্ণিত নেই, বরং পরবর্তী যুগের মুজতাহিদ ফকিহগণ (মাশায়েখ) নতুন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ইজতেহাদ করে বের করেছেন, সেগুলোকে 'মাসায়িলুল ওয়াকিয়াত' বলা হয়।"

উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট: ইমামগণের ইন্তেকালের পর মুসলিম সমাজ ব্যববসায়, লেনদেনে এবং জীবনযাত্রায় নতুন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। যেহেতু যাহিরুর রিওয়ায়াহ বা নাওয়াদিরে এগুলোর সরাসরি হুকুম ছিল না, তাই পরবর্তী যুগের ফকিহগণ ইমামদের শেখানো মূলনীতি (উসুল) প্রয়োগ করে ইজতেহাদ বা গবেষণা করেন। এই গবেষণালব্ধ ফতোয়াগুলোই 'ওয়াকিয়াত' নামে পরিচিত। এর উদ্দেশ্য হলো— যুগের চাহিদাকে পূরণ করা এবং শরীয়তের বিধানকে গতিশীল রাখা।

এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ লেখক ও কিতাবসমূহ (أشهر المؤلفين والكتب): 'মাসায়িলুল ওয়াকিয়াত' সংকলনে হানাফি মাযহাবের অনেক মহান ফকিহ অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন এবং তাঁদের কিতাবের নাম নিচে দেওয়া হলো:

১. আবুল লাইস আস-সমরকন্দী (রহ.) [মৃত: ৩৭৩ হি.]: তিনি 'আন-নাওয়াজিল' (النوازل) নামক কিতাব রচনা করেন। এটি এই শাস্ত্রের অন্যতম আদি ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। তাঁকে ফকিহদের এই স্তরের ইমাম বলা হয়।

২. ইমাম নাতীফী (রহ.) [মৃত: ৪৪৬ হি.]: তিনি 'মাজমাউল ওয়াকিয়াত' বা 'আল-ওয়াকিয়াত' (الواقعات) নামে কিতাব সংকলন করেন। এতে তিনি সমসাময়িক ফতোয়াগুলো একত্রিত করেছেন।

৩. আস-সদরুশ শহীদ (রহ.) [মৃত: ৫৩৬ হি.]: তিনি 'আল-ওয়াকিয়াত' (الواقعات) নামে একটি বিখ্যাত কিতাব লিখেছেন, যা হানাফি ফিকহে অত্যন্ত সমাদৃত।

৪. কাযী খান (রহ.) [মৃত: ৫৯২ হি.]: তাঁর রচিত 'ফতোয়ায়ে কাযী খান' (فتاوى قاضي خان) বা 'আল-খানিয়া' হানাফি মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফতোয়া গ্রন্থ। মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত (মুফতা বিহি) জানার জন্য এটি একটি অপরিহার্য উৎস। আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, কাযী খানের তারজিহ বা প্রাধান্য অন্য অনেকের চেয়ে অগ্রগণ্য।

৫. বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী (রহ.) [মৃত: ৫৯৩ হি.]: তিনি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আত-তাজনীস ওয়াল মাযীদ' (التجنيس والمزيد)-এ অনেক ওয়াকিয়াত সংকলন করেছেন।

ফতোয়ায় এর অবস্থান: মুফতির জন্য নিয়ম হলো, প্রথমে যাহিরুর রিওয়ায়াহ দেখা, এরপর নাওয়াদির, এবং সবশেষে এই ওয়াকিয়াত দেখা। তবে ওয়াকিয়াতের কিতাবগুলোতে যদি মাশায়েখগণ কোনো মতকে 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর ওপর প্রাধান্য দেন (দলীলের কারণে বা যুগের প্রয়োজনে), তবে মুফতি সে অনুযায়ী ফতোয়া দিতে পারেন।

উপসংহার (خاتمة): 'মাসায়িলুল ওয়াকিয়াত' হলো হানাফি ফিকহের জীবন্ত রূপ। এটি প্রমাণ করে যে, ফিকহ কোনো স্থবির বিষয় নয়। প্রসিদ্ধ ফকিহগণের এই সংকলনগুলোই আজ পর্যন্ত মুফতিদেরকে আধুনিক সমস্যার সমাধানে পথ দেখাচ্ছে।

প্রশ্ন-২৮: হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য উক্তি ও দুর্বল উক্তির মধ্যে কীভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়?

(كيف يتم التمييز بين القول المعتمد والقول الضعيف في المذهب الحنفي؟)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি মাযহাবের সুবিশাল ফিকহ ভাণ্ডারে একই মাসআলায় একাধিক মত বা উক্তি (আকওয়াল) পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু মত শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য (মুতামাদ), আবার কিছু মত দুর্বল (জয়িফ)। ফতোয়া দেওয়ার সময় মুফতিকে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য মতটি বেছে নিতে হয়। এই পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য ফকিহগণ কিছু সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড বা 'আলামত' ঠিক করে দিয়েছেন।

নির্ভরযোগ্য ও দুর্বল উক্তি নির্ণয়ের পদ্ধতিসমূহ (طرق التمييز):

১. বর্ণনার স্তরের ভিত্তিতে (حسب طبقات الكتب): সবচেয়ে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মত হলো তা, যা **'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'**-এর কিতাবগুলোতে (যেমন—মাবসুত, জামে সগির) বর্ণিত হয়েছে।

- **পার্থক্য:** যদি কোনো মত যাহিরুর রিওয়ায়াতে থাকে আর অন্য একটি মত 'নাওয়াদির' বা 'ওয়াকিয়াত'-এ থাকে, তবে যাহিরুর রিওয়ায়াহর মতটিই নির্ভরযোগ্য (মুতামাদ), আর অন্যটি দুর্বল (যদি না মাশায়েখগণ বিশেষ কারণে অন্যটিকে প্রাধান্য দেন)।

২. ইমামগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে (اتفاق الأئمة):

- **মুতামাদ:** যে মতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর দুই প্রধান ছাত্র (সাহিবাইন) একমত হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে মাযহাবের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মত।

- **দুর্বল:** যে মতটি কোনো একক ছাত্র বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম ও অন্য ছাত্রদের মতের বিরোধী, তা সাধারণত দুর্বল হিসেবে গণ্য হয়।

৩. তারজিহ বা প্রাধান্যের পরিভাষা দেখে (مصطلحات الترجيح): কিতাবে ব্যবহৃত বিশেষ কিছু পরিভাষা দেখে মুফতি বুঝতে পারেন কোনটি নির্ভরযোগ্য।

- **নির্ভরযোগ্য উক্তির আলামত:** ফকিহগণ যদি বলেন— **"এর ওপর ফতোয়া"** (عليه الفتوى), **"এর ওপর আমল"** (عليه العمل), **"এটিই সহিহ"** (هذا هو الصحيح), **"এটি অধিকতর সহিহ"** (هو الأصح), বা **"এটি নির্ভরযোগ্য"** (هو المعتمد)। এই শব্দগুলো থাকলে বুঝতে হবে এটিই শক্তিশালী মত।

- **দুর্বল উক্তির আলামত:** যদি বলা হয়— **"বলা হয়ে থাকে"** (قيل - ক্বীলা), অথবা কোনো তারজিহ শব্দ ছাড়াই মতটি উল্লেখ করা হয় এবং এর বিপরীতে শক্তিশালী মত থাকে, তবে তা দুর্বল।

৪. 'আসহাবুত তারজিহ'-এর সিদ্ধান্ত (تصحيح المشايخ): মাযহাবের বড় বড় ফকিহ বা 'আসহাবুত তারজিহ' (যেমন— কুদুরী, হেদায়া প্রণেতা, কাযী খান, আল্লামা শামী) যেই মতটিকে গ্রহণ করেছেন বা সহিহ বলেছেন, সেটিই মুতামাদ। তাঁরা যাকে বর্জন করেছেন, তা দুর্বল।

- *উদাহরণ:* হেদায়া কিতাবে যদি বলা হয় "আমাদের মাযহাব হলো এটি", তবে সেটিই মুতামাদ।

৫. দলিল ও উসুলের সাথে সামঞ্জস্য (موافقة الأصول): যে মতটি মাযহাবের উসুল বা মূলনীতির সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা নির্ভরযোগ্য। আর যা উসুলের বিরোধী বা 'শায' (বিচ্ছিন্ন), তা দুর্বল।

- *নিয়ম:* মুফতি দেখবেন কোন মতটির দলিল শক্তিশালী। তবে সাধারণ মুফতি (মুকাল্লিদ) নিজে দলিল বিচার করবেন না, বরং কিতাবের রায়ের ওপর নির্ভর করবেন।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, নির্ভরযোগ্য ও দুর্বল মতের পার্থক্য নির্ণয় করা মুফতির জন্য ফরজ। দুর্বল মতের ওপর ফতোয়া দেওয়াকে ফকিহগণ 'হারাম' এবং 'খিয়ানত' বলেছেন। মুফতিকে অবশ্যই কিতাবের ভাষা, ইমামদের অবস্থান এবং মাশায়েখদের তারজিহ লক্ষ্য করে 'মুফতা বিহি' (ফতোয়াযোগ্য) মতটি বের করতে হবে।

প্রশ্ন-২৯: হানাফীদের নিকট 'মুজতাহিদুল ফতোয়া' স্তরের চারজন প্রধান ইমামের নাম উল্লেখ কর।

(اذكر أربعة من أبرز الأئمة في طبقة مجتهدي الفتوى عند الحنفية.)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি মাযহাবের ফকিহগণের শ্রেণিবিন্যাসে (Tabaqat al-Fuqaha) বিভিন্ন স্তরের মুজতাহিদ রয়েছেন। এর মধ্যে একটি বিশেষ স্তর হলো 'মুজতাহিদুল মাসায়েল' বা 'মুজতাহিদ ফিল ফতোয়া'। এঁরা মাযহাবের ইমামগণের (ইমাম আবু হানিফা ও সাহিবাইন) উসুলের অনুসরণ করে নতুন উদ্ভূত সমস্যা বা 'নাওয়াজিল'-এর সমাধান দিতেন। এই স্তরের ইমামগণ হানাফি ফিকহের প্রসারে এবং ফতোয়া বিভাগে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

মুজতাহিদুল ফতোয়া স্তরের পরিচয়: আল্লামা ইবনে কামাল পাশা (রহ.)-এর শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী এটি তৃতীয় স্তর। এই স্তরের ফকিহগণ উসুল এবং ফুরু (শাখা মাসআলা)—উভয় ক্ষেত্রেই মাযহাবের ইমামের আনুগত্য করেন। কিন্তু যেসব বিষয়ে ইমাম থেকে কোনো রিওয়ায়াত বা বর্ণনা নেই, সেসব বিষয়ে তাঁরা ইমামের উসুলের আলোকে ইজতেহাদ করে ফতোয়া দেন।

চারজন প্রধান ইমামের পরিচিতি: নিচে এই স্তরের চারজন জগৎবিখ্যাত হানাফি ইমামের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

১. ইমাম খাসসাফ (রহ.) [মৃত: ২৬১ হি.]:

- **নাম ও পরিচিতি:** তাঁর পূর্ণ নাম আহমদ ইবনে আমর আল-খাসসাফ। তিনি ছিলেন আব্বাসীয় খলিফা মুহতাদীর দরবারের বিশেষ ফকিহ।
- **অবদান:** তিনি 'আদাবুল কাজি' (বিচারকের শিষ্টাচার), 'কিতাবুল হিয়াল' (কৌশল শাস্ত্র) এবং 'কিতাবুল ওয়াকফ' রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিচার ব্যবস্থা ও ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর ইজতেহাদ হানাফি

মাযহাবে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। বিশেষ করে ওয়াকফ সংক্রান্ত মাসআলায় তাঁর মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

২. ইমাম ত্বহাবী (রহ.) [মৃত: ৩২১ হি.]:

- **নাম ও পরিচিতি:** তাঁর পূর্ণ নাম আবূ জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আত-ত্বহাবী। তিনি মিশরের অধিবাসী ছিলেন। প্রথমে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, পরে হানাফি মাযহাব গ্রহণ করেন এবং হানাফি ফিকহের প্রধান স্তম্ভে পরিণত হন।

- **অবদান:** তিনি হাদিস ও ফিকহের সমন্বয়ে এক অনন্য নজির স্থাপন করেন। তাঁর রচিত 'শরহু মাআনিল আসার' এবং 'মুশকিলুল আসার' হাদিস ও ফিকহের অপূর্ব সংমিশ্রণ। এছাড়া তাঁর 'আকিদা ত্বহাবীয়া' আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার প্রামাণ্য গ্রন্থ। ফতোয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ইজতেহাদ বা গবেষণা অত্যন্ত গভীর এবং শক্তিশালী।

৩. ইমাম কারখী (রহ.) [মৃত: ৩৪০ হি.]:

- **নাম ও পরিচিতি:** তাঁর পূর্ণ নাম আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ ইবনে হুসাইন আল-কারখী। তিনি বাগদাদের হানাফি আলেমদের প্রধান (রইস) ছিলেন। তিনি ছিলেন যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) ও তাকওয়ার মূর্ত প্রতীক।

- **অবদান:** তিনি উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রে 'রিসালাতুল কারখী' বা 'উসুলুল কারখী' রচনা করেন। ফিকহী মাসআলা বের করার (ইস্তিম্বাত) ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তিনি মাসআলা বর্ণনার চেয়ে উসূল বা মূলনীতি প্রতিষ্ঠায় বেশি জোর দিতেন। তাঁর ছাত্র ইমাম জাসসাস (রহ.) তাঁর ইলমকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

৪. শামসুল আইম্মাহ আল-হালওয়ানী (রহ.) [মৃত: ৪৪৮ হি.]:

- **নাম ও পরিচিতি:** তাঁর পূর্ণ নাম আব্দুল আজিজ ইবনে আহমদ আল-হালওয়ানী। বুখারার অধিবাসী এই মহান ফকিহকে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে 'শামসুল আইম্মাহ' বা 'ইমামদের সূর্য' উপাধি দেওয়া হয়।

- **অবদান:** তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ফিকহকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সেতুর ভূমিকা পালন করেন। তাঁর ছাত্র শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (রহ.) তাঁর কাছ থেকেই ইলম অর্জন করে বিখ্যাত 'মাবসুত' রচনা করেন। হালওয়ানী (রহ.)-এর ফতোয়াগুলো সমকালীন জটিল সমস্যার সমাধানে মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে।

উপসংহার (خاتمة): এই চারজন ইমাম—ইমাম খাসসাফ, ইমাম ত্বহাবী, ইমাম কারখী এবং ইমাম হালওয়ানী (রহ.)—হানাফি মাযহাবের প্রাণশক্তি। তাঁরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর উদ্ভূত হাজার হাজার নতুন সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। বর্তমান যুগের মুফতিরা যখন কোনো নতুন বিষয়ে ফতোয়া দেন, তখন তাঁরা এই ইমামগণের ইজতেহাদের ওপরই নির্ভর করেন।

প্রশ্ন-৩০: হানাফী মাযহাবের বিধি-বিধানের অগ্রাধিকার ও মতপার্থক্যের উপর ফকীহগণের স্তরসমূহের প্রভাব আলোচনা কর।
ناقش أثر طبقات الفقهاء على ترجيح واختلاف الأحكام في المذهب الحنفي.)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি মাযহাবে ফতোয়া প্রদান এবং মাসআলা চয়নের ক্ষেত্রে 'ফকিহগণের স্তরবিন্যাস' (Tabaqat al-Fuqaha) একটি অপরিহার্য মানদণ্ড। আল্লামা ইবনে কামাল পাশা (রহ.) হানাফি ফকিহগণকে সাতটি স্তরে ভাগ করেছেন। মাযহাবের ভেতরে মতভেদ দেখা দিলে বা কোনো মতকে অগ্রাধিকার (Tarjih) দেওয়ার ক্ষেত্রে এই স্তরগুলো বিচারকের ভূমিকা পালন করে। নিচের আলোচনায় এর প্রভাব ব্যাখ্যা করা হলো।

অগ্রাধিকার ও মতপার্থক্যের ওপর ফকিহগণের স্তরের প্রভাব:

১. মতবিরোধ নিরসনে উচ্চ স্তরের প্রাধান্য (تقديم الطبقة العليا عند الاختلاف): মাযহাবের ভেতরে যখন বিভিন্ন ইমামের মতের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন মুফতিকে দেখতে হয় বর্ণনাকারী কোন স্তরের ফকিহ।

- **মূলনীতি:** উঁচুর স্তরের ফকিহের মতামত নিচের স্তরের ফকিহের মতের ওপর প্রাধান্য পাবে।

- **উদাহরণ:** যদি কোনো মাসআলায় 'মুজতাহিদে মুতলাক' (১ম স্তর: ইমাম আবু হানিফা) এবং 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' (২য় স্তর: ইমাম আবু ইউসুফ)-এর মধ্যে মতভেদ হয়, তবে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ১ম স্তরের ইমামের মত প্রাধান্য পাবে। সাহিবাইনের (২য় স্তর) মত ইমাম ত্বহাবী (৩য় স্তর)-এর মতের চেয়ে শক্তিশালী হবে। এই স্তরবিন্যাস মুফতিকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে।

২. তারজিহ বা প্রাধান্য প্রদানে স্তরের ভূমিকা (دور الطبقات في الترجيح): ৫ম স্তরের ফকিহগণ হলেন 'আসহাবুত তারজিহ' (যেমন— কুদুরী, মারগীনানী)। তাঁদের কাজ হলো বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য থেকে শক্তিশালী মতটি বাছাই করা।

- **প্রভাব:** যদি আসহাবুত তারজিহ কোনো মতকে 'সহিহ' বা 'ফতোয়াযোগ্য' বলেন, তবে পরবর্তী যুগের মুফতিদের (৭ম স্তর) জন্য সেই মতটি গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে যায়। আসহাবুত তারজিহ-এর সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত ইজতেহাদ করার ক্ষমতা সাধারণ মুফতিদের নেই।

৩. দুর্বল ও সবল মতের পার্থক্য নির্ণয় (تمييز القوي من الضعيف): ফকিহগণের স্তরবিন্যাস ফতোয়া শাস্ত্রে দুর্বল মত বর্জনে সহায়তা করে।

- **প্রভাব:** যদি কোনো মাসআলা ৩য় স্তরের (মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল) কোনো ইমাম বর্ণনা করেন, কিন্তু তা ১ম বা ২য় স্তরের ইমামদের উসুলের বিরোধী হয়, তবে তা 'শায' বা দুর্বল হিসেবে গণ্য হবে। স্তরবিন্যাস না থাকলে সব মত গুলিয়ে যেত এবং মাযহাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো।

৪. ফতোয়া প্রদানে মুফতির সীমারেখা নির্ধারণ (تحديد صلاحيات المفتي): বর্তমান যুগের মুফতিগণ হলেন ৭ম স্তরের (মুকাল্লিদ মাহাদ)। স্তরবিন্যাসের জ্ঞান তাঁদেরকে নিজেদের সীমারেখা মনে করিয়ে দেয়।

- **প্রভাব:** একজন ৭ম স্তরের মুফতি চাইলেই ১ম স্তরের ইমামের রায়ের বিরোধিতা করতে পারেন না। তিনি কেবল পূর্ববর্তী স্তরের ফকিহদের (যেমন— কাজিখান বা শামী) দেওয়া ফতোয়া নকল (Naqil) করতে পারেন। এর ফলে শরীয়তের বিধান সংরক্ষিত থাকে এবং যে কেউ নিজের মনগড়া ফতোয়া দিতে পারে না।

৫. যুগের প্রয়োজনে স্তর পরিবর্তন (تغير الأحكام بتغير الزمان): কখনো কখনো যুগের প্রয়োজনে নিচের স্তরের ইমামের মতকে উপরের স্তরের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, যা 'আসহাবুত তারজিহ' নির্ধারণ করেন।

- **উদাহরণ:** ইস্তিসনা (অর্ডার দিয়ে পণ্য তৈরি)-এর ক্ষেত্রে কিয়াস অনুযায়ী তা জায়েজ ছিল না (ইমাম আবু হানিফার প্রাথমিক মত), কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে ও উরফের কারণে পরবর্তী স্তরের ফকিহগণ একে জায়েজ বলেছেন। এখানে স্তরের প্রভাব হলো— পরবর্তী স্তরের ফকিহগণ যুগের চাহিদা বুঝতে পেরে মাযহাবের উসুলের ভেতরে থেকেই সমাধান দিয়েছেন।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, হানাফি মাযহাবে 'ফকিহগণের স্তরবিন্যাস' কোনো তাত্ত্বিক বিষয় মাত্র নয়, বরং এটি ফতোয়া বিভাগের সংবিধান। এটি মতভেদের সময় সঠিক পথ দেখায়, দুর্বল মতকে বাতিল করে এবং যোগ্যতম ব্যক্তির মতকে উম্মাহর সামনে তুলে ধরে। এই স্তরবিন্যাস মান্য করার ফলেই হানাফি ফিকহ হাজার বছর ধরে সুশৃঙ্খলভাবে টিকে আছে।

নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ

প্রশ্ন-৩১: হানাফীদের নিকট 'নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ'-এর বৈশিষ্ট্য কী কী, যা সেগুলোকে অন্যদের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়?

(ما هي خصائص "الكتب المعتمدة" عند الحنفية التي تجعلها مقدمة على غيرها؟)

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া প্রদান একটি অত্যন্ত নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। হানাফি মাযহাবে হাজার হাজার কিতাব রচিত হয়েছে, কিন্তু ফতোয়া দেওয়ার জন্য সব কিতাব সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কিছু কিতাবকে 'নির্ভরযোগ্য' বা 'মুতামাদ' (Kutub Mu'tamadah) বলা হয়। এসব কিতাবের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এগুলোকে অন্য সাধারণ কিতাবের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য করে তুলেছে।

নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (خصائص الكتب المعتمدة):

১. 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনার প্রাধান্য (الاعتماد على ظاهر الرواية): নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোতে হানাফি মাযহাবের মূল ভিত্তি অর্থাৎ 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর মাসআলাগুলো সংকলন করা হয়েছে।

- **ব্যাখ্যা:** ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর ৬টি মূল কিতাব বা পরবর্তী যুগের 'মাবসুত', 'হিদায়া', 'কুদূরী'-এর মতো কিতাবগুলোতে মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত ও মশহুর মতগুলো স্থান পেয়েছে। এগুলোতে 'নাওয়াদির' বা বিরল বর্ণনা খুব কম আনা হয়েছে, আর আনলেও তা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে।

২. লেখকের যোগ্যতা ও মর্যাদা (جلالة قدر المؤلف): নির্ভরযোগ্য কিতাব হওয়ার জন্য লেখকের ফিকহী মর্যাদা (Faqih Nafs) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **ব্যাখ্যা:** যে কিতাবের লেখক ফকিহদের উচ্চ স্তরের (যেমন— মুজতাহিদ বা আসহাবুত তারজিহ) অন্তর্ভুক্ত, সেই কিতাব নির্ভরযোগ্য। যেমন— আল্লামা মারগীনানী, আল্লামা ইবনে হুমাম, আল্লামা শামী (রহ.)। তাঁরা কেবল সংকলক ছিলেন না, বরং ভুল-শুদ্ধ যাচাইয়ের ক্ষমতা রাখতেন।

পক্ষান্তরে, যে লেখকের গভীর ইলম নেই বা যিনি কেবল নকলনবিশ, তাঁর কিতাব ফতোয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য নয়।

৩. উম্মাহর গ্রহণযোগ্যতা (التلقي بالقبول): যে কিতাবটি যুগ যুগ ধরে ওলামায়ে কেরাম ও মুফতিদের মাঝে পঠিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে, তা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য।

- **ব্যাখ্যা:** যেমন— 'হেদায়া' কিতাবটি সারা বিশ্বে হানাফিদের কাছে গ্রহণযোগ্য। একইভাবে 'ফতোয়ায়ে শামী' (রদ্দুল মুহতার) পরবর্তী যুগের ফতোয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই 'তাকাব্বুল' বা গ্রহণযোগ্যতাই কিতাবটিকে সনদের মর্যাদায় আসীন করে।

৪. তারজিহ বা প্রধান্য দেওয়ার পদ্ধতি (منهج الترجيح): নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোতে কেবল মাসআলা জমা করা হয়নি, বরং মতভেদপূর্ণ বিষয়ে কোনটি শক্তিশালী (রাজীহ) আর কোনটি দুর্বল (মাজরুহ), তা স্পষ্ট করা হয়েছে।

- **ব্যাখ্যা:** কিতাবগুলোতে 'আসাহ', 'আহওয়াত', 'মুফতা বিহি'— এজাতীয় পরিভাষা ব্যবহার করে মুফতিকে সঠিক ফতোয়াটি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন— 'দুররুল মুখতার' ও 'কানযুদ দাকায়েক' কিতাবে প্রতিটি শব্দের মাধ্যমে হুকুমের পর্যায় বোঝানো হয়েছে।

৫. দলিল ও উসুলের সমন্বয় (الجمع بين الدليل والأصل): নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোতে মাসআলার পাশাপাশি তার দলিল (নকলী ও আকলী) এবং মাযহাবের উসুল উল্লেখ করা হয়েছে।

- **ব্যাখ্যা:** এতে মুফতি বুঝতে পারেন যে, বিধানটি কোন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যেমন— 'বাদায়েউস সানায়ে' কিতাবে মাসআলার বিন্যাস ও দলিলের উপস্থাপন এতটাই চমৎকার যে, তা ফকিহকে প্রশান্তি দেয়।

৬. দুর্বল ও বাতিল মত বর্জন (اجتناب الأقوال الضعيفة): নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো মাযহাবের দুর্বল, প্রত্যাখ্যাত বা মানসুখ (রহিত) মতামতগুলো বর্জন করে।

- **বিপরীত চিত্র:** অনেক অনির্ভরযোগ্য কিতাবে (যেমন— কিছু সাধারণ ওয়াযের কিতাব বা অখ্যাত সংকলন) ভিত্তিহীন গল্প বা দুর্বল হাদিসের ওপর ভিত্তি করে মাসআলা লেখা থাকে, যা ফতোয়ার জন্য বিপদজনক।

উপসংহার (خاتمة): হানাফি মাযহাবে 'নির্ভরযোগ্য কিতাব' হলো মুফতির জন্য কম্পাসস্বরূপ। এই কিতাবগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো— বিশুদ্ধ বর্ণনা, যোগ্য লেখক, উম্মাহর স্বীকৃতি এবং তারজিহ বা যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষমতা। একজন মুফতি যখন ফতোয়া লেখেন, তখন তাঁকে অবশ্যই এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কিতাবগুলোর (যেমন— হিদায়া, শামী, আলমগীরী) ওপর নির্ভর করতে হয়।

প্রশ্ন-৩২: লেখকের নাম সহ হানাফী মাযহাবের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরযোগ্য কিতাবের নাম উল্লেখ কর।

(اذكر خمسة من أهم الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي، مع ذكر مؤلفيها.)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি মাযহাব একটি সুশৃঙ্খল এবং সুবিন্যস্ত ফিকহী স্কুল। হাজার বছর ধরে এই মাযহাবে অসংখ্য কিতাব রচিত হয়েছে। তবে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সব কিতাবের মর্যাদা সমান নয়। মুফতিদের জন্য এমন কিছু কিতাব রয়েছে, যা 'আল-কুতুবুল মুতামাদাহ' বা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। এই কিতাবগুলো মাযহাবের বিশুদ্ধ মত বা 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' সংরক্ষণে এবং তারজিহ (প্রাধান্য) প্রদানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে এমন পাঁচটি প্রধান কিতাবের পরিচয় ও লেখকের নাম উল্লেখ করা হলো।

১. আল-মাবসুত (المبسوط):

- **লেখক:** শামসুল আইম্মাহ আল-সারাখসী (রহ.) [মৃত: ৪৮৩ হি.]।
- **পরিচিতি ও গুরুত্ব:** এটি হানাফি মাযহাবের সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোর অন্যতম। মূলত ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর 'কাফি' গ্রন্থের ব্যাখ্যা হিসেবে এটি রচিত। ইমাম সারাখসী (রহ.) কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় স্মৃতি থেকে এই বিশাল গ্রন্থটি (৩০ খণ্ড) ছাত্রদের লিখিয়েছিলেন।
- **ফতোয়ায় অবস্থান:** হানাফি মাযহাবের 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা মূল মত জানার জন্য এটি চূড়ান্ত উৎস। ফতোয়ার ক্ষেত্রে এর উদ্ধৃতি দলিলের

শক্তি হিসেবে কাজ করে। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) ফতোয়া দেওয়ার সময় এর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন।

২. আল-হিদায়া (الهداية):

- **লেখক:** বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী আল-মারগীনানী (রহ.) [মৃত: ৫৯৩ হি.]।
- **পরিচিতি ও গুরুত্ব:** এই কিতাবটিকে হানাফি ফিকহের 'তাজ' বা মুকুট বলা হয়। লেখক দীর্ঘ ১৩ বছর রোজা রেখে অত্যন্ত ইখলাসের সাথে এটি রচনা করেন। এতে তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং সাহিবাইন-এর মতামতের পক্ষে যুক্তিপূর্ণ দলিল উপস্থাপন করেছেন এবং অন্যান্য মাযহাবের মত খণ্ডন করেছেন।
- **ফতোয়ায় অবস্থান:** হানাফি মাযহাবে ফতোয়া প্রদানে 'হিদায়া' একটি মাইলফলক। বলা হয়, "যে ব্যক্তি হিদায়া পড়েনি, সে ফিকহ-এর স্বাদ পায়নি।" এর ইবারত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থ অত্যন্ত গভীর।

৩. বাদায়েউস সানায়ে (بدائع الصنائع):

- **লেখক:** ইমাম আলাউদ্দিন আল-কাসানী (রহ.) [মৃত: ৫৮৭ হি.]।
- **পরিচিতি ও গুরুত্ব:** ফিকহী কিতাবসমূহের মধ্যে বিন্যাস ও উপস্থাপনার দিক থেকে এটি অনন্য। লেখক তাঁর শিক্ষক ইমাম সমরকন্দীর কিতাব 'তুহফাতুল ফুকাহা'-এর ব্যাখ্যা হিসেবে এটি লিখেন। এর যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং মাসআলার ক্রমবিন্যাস মুফতিদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।
- **ফতোয়ায় অবস্থান:** এই কিতাবটি মাযহাবের দলিল ও যুক্তির ভাণ্ডার। ফতোয়া লেখার সময় দলিলের জন্য মুফতিরা এই কিতাবের শরণাপন্ন হন। এর উপাধি হলো 'ফিকহী কিতাবের রাজকুমারী'।

৪. ফতোয়ায়ে কাজিখান (فتاوى قاضي خان):

- **লেখক:** ফখরুদ দ্দীন হাসান ইবনে মানসুর আল-উজজান্দী, যিনি 'কাজিখান' নামে পরিচিত (রহ.) [মৃত: ৫৯২ হি.]।

- **পরিচিতি ও গুরুত্ব:** এটি 'ফতোয়া' বা 'ওয়াকিয়াত' বিষয়ক কিতাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। লেখক কেবল মাসআলা জমা করেননি, বরং সেগুলোকে যাচাই-বাছাই (নকদ) করেছেন।

- **ফতোয়ায় অবস্থান:** আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, "কাজিখানের তারজিহ (প্রাধান্য) অন্য অনেকের চেয়ে অগ্রগণ্য।" ফতোয়া প্রদানের সময় যদি মতভেদ দেখা দেয়, তবে কাজিখানের রায়কে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়। এটি মাযহাবের 'মুফতা বিহি' কওলের অন্যতম উৎস।

৫. রদ্দুল মুহতার বা ফতোয়ায়ে শামী (رد المحتار على الدر المختار):

- **লেখক:** আল্লামা সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) [মৃত: ১২৫২ হি.]।

- **পরিচিতি ও গুরুত্ব:** এটি হানাফি ফিকহের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন হিসেবে বিবেচিত। এটি মূলত 'দুররুল মুখতার'-এর হাশিয়া বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ। লেখক পূর্ববর্তী সকল কিতাবের নির্যাস এতে নিয়ে এসেছেন।

- **ফতোয়ায় অবস্থান:** বর্তমান বিশ্বে হানাফি মুফতিদের জন্য এটি প্রধান অবলম্বন। কোনো মাসআলায় আল্লামা শামী (রহ.)-এর সিদ্ধান্ত থাকলে তার বিপরীতে ফতোয়া দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এটি ফতোয়া জগতের চূড়ান্ত সংবিধানতুল্য।

উপসংহার (خاتمة): এই পাঁচটি কিতাব—মাবসুত, হিদায়া, বাদায়ে, কাজিখান এবং শামী—হানাফি মাযহাবের পাঁচটি স্তম্ভের মতো। মুফতি হওয়ার জন্য এবং সঠিক ফতোয়া প্রদানের জন্য এই কিতাবগুলোর সাথে গভীর সম্পর্ক রাখা অপরিহার্য।

প্রশ্ন-৩৩: 'আল-মারগীনানী কৃত হিদায়া কিতাবটি কেন ফতোয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরযোগ্য কিতাব হিসেবে বিবেচিত?

(لماذا يعتبر كتاب "الهداية" للمرغيناني من أهم الكتب المعتمدة في الإفتاء؟)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি ফিকহের ইতিহাসে আল্লামা বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী (রহ.) রচিত 'আল-হিদায়া' (الهداية) কিতাবটি এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এটি কেবল একটি পাঠ্যবই নয়, বরং ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড। ফিকহ ও ফতোয়া জগতে এর গ্রহণযোগ্যতা এত বেশি যে, একে বলা হয়, "হিদায়া হলো ফিকহের কুরআনের মতো, যা কোনো পূর্ববর্তী কিতাব দ্বারা রহিত হয় না।"

ফতোয়ার ক্ষেত্রে হিদায়ার গুরুত্বের কারণসমূহ:

১. যাহিরুর রিওয়ায়াহ নির্বাচন (اختيار ظاهر الرواية): ফতোয়া প্রদানের জন্য 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা মাযহাবের মূল বর্ণনা জানা জরুরি। 'হিদায়া' কিতাবে আল্লামা মারগীনানী অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর ছাত্রদের হাজার হাজার মাসআলার মধ্য থেকে কেবল 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা নির্ভরযোগ্য মতগুলো সংকলন করেছেন। ফলে মুফতিরা নিশ্চিন্তে এর ওপর নির্ভর করতে পারেন।

২. দলিল ও যুক্তির সমন্বয় (الجمع بين الدليل والتعليل): হিদায়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এতে কেবল মাসআলা বলা হয়নি, বরং প্রতিটি মাসআলার পেছনে কুরআন-সুন্নাহর দলিল (নকলী) এবং যৌক্তিক কারণ (আকলী) উল্লেখ করা হয়েছে। ফতোয়া প্রদানের সময় মুফতিকে অনেক সময় প্রশ্নকারীর কাছে যুক্তি তুলে ধরতে হয়। হিদায়া মুফতিকে সেই 'ফিকহী যুক্তি' বা ইস্তিম্বাতের শক্তি জোগায়।

৩. মতভেদ নিরসন ও তারজিহ (رفع الخلاف والترجيح): হানাফি মাযহাবে ইমামদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা মারগীনানী হিদায়াতে এই মতভেদগুলো উল্লেখ করে শেষে একটি ফয়সালা বা 'তারজিহ' দিয়েছেন। তিনি সাধারণত বলেন, "আমাদের মাযহাব হলো এটি" বা "এর ওপর ফতোয়া"। এই তারজিহ ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুফতির কাজকে সহজ করে দেয়। মুফতিকে নতুন করে গবেষণার কষ্টে পড়তে হয় না।

৪. বাতিল ও দুর্বল মত খণ্ডন (رد الأقوال الضعيفة): হিদায়া কিতাবে লেখক শাফেয়ী বা অন্য মাযহাবের মত এবং হানাফি মাযহাবের দুর্বল মতগুলোকে অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন। এটি মুফতিকে শেখায় কীভাবে বাতিলের মোকাবিলা করতে হয় এবং হকের ওপর অটল থাকতে হয়।

৫. বিন্যাস ও সংক্ষিপ্ততা (الترتيب والإيجاز): হিদায়ার ইবারত বা বাক্যগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থবহ (জামে ও মানে)। ফতোয়া লেখার সময় মুফতিদের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ ভাষা ব্যবহার করতে হয়। হিদায়ার ভাষা মুফতিদের জন্য আদর্শ বা মডেল হিসেবে কাজ করে। এর অধ্যায় বিন্যাস ফতোয়ার বিষয়বস্তু খুঁজতে সাহায্য করে।

৬. উম্মাহর গ্রহণযোগ্যতা (التلقي بالقبول): শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বের সকল প্রান্তের হানাফি আলেম ও মুফতিগণ হিদায়াকে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমনকি আল্লামা শামী (রহ.)-এর মতো মুহাক্কিক আলেমও হিদায়ার রায়ের ওপর নির্ভর করেছেন। এই 'ইজমায়ে উম্মাহ' বা উম্মাহর ঐকমত্য হিদায়াকে ফতোয়ার জন্য অপরিহার্য করে তুলেছে।

একটি উদাহরণ: অনেক কিতাবে বলা হয়েছে, "হিদায়া যেমন মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়, তেমনি এটি মুফতিকেও ভুলের অন্ধকার থেকে বাঁচিয়ে সঠিক ফতোয়ার পথে পরিচালিত করে।"

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, 'হিদায়া' কেবল মাসআলার সমষ্টি নয়, বরং এটি ফিকহী মেধা তৈরির কারখানা। এটি মুফতিকে শুধু মাছ দেয় না, মাছ ধরা শেখায় (ইজতেহাদ ও কিয়াস শেখায়)। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা, শক্তিশালী দলিল এবং সঠিক তারজিহ—এই তিনের সমন্বয়ে 'হিদায়া' ফতোয়া শাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন-৩৪: অ-নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের প্রকারভেদ কী কী? প্রমাণ ছাড়া সেগুলোতে যা এসেছে, তদনুযায়ী ফতোয়া দেওয়ার বিধান কী?
ما هي أنواع "الكتب غير المعتمدة"؟ وما حكم الإفتاء بما ورد فيها دون (دليل؟

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া প্রদান একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর দায়িত্ব, কারণ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান জানানো। মুফতির জন্য অপরিহার্য হলো ফতোয়া প্রদানের সময় নির্ভরযোগ্য উৎস বা 'কুতুবুল মুতামাদাহ' ব্যবহার করা। এর বিপরীতে এমন কিছু কিতাব রয়েছে যা ফতোয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য নয়। হানাফি মাযহাবের 'রসমুল মুফতি' শাস্ত্রে অ-নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে মুফতিরা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) তাঁর 'শরহু উকুদি রসমিল মুফতি' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

অ-নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের প্রকারভেদ (أنواع الكتب غير المعتمدة):

১. দুর্বল বর্ণনাকারীদের কিতাব (كتب الروايات الضعيفة): কিছু কিতাব এমন লেখকদের দ্বারা রচিত, যারা মাসআলা যাচাই-বাছাই (তাহকিক) করার যোগ্যতা রাখতেন না। তারা যা শুনেছেন বা পেয়েছেন, তা-ই কিতাবে স্থান দিয়েছেন। যেমন— কোনো কোনো ওয়াযের কিতাব বা সাধারণ গল্পের বই, যেখানে দুর্বল ও ভিত্তিহীন মাসআলা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. শায বা বিরল মাসআলার কিতাব (كتب المسائل الشاذة): যেসব কিতাবে মাযহাবের মূলধারা বা 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর বিপরীত বিরল (শায) মতগুলো প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই কিতাবগুলো গবেষণার জন্য কাজে লাগতে পারে, কিন্তু সাধারণ ফতোয়ার জন্য এগুলো অ-নির্ভরযোগ্য।

৩. অন্যান্য মাযহাবের কিতাব (كتب المذاهب الأخرى): হানাফি মুফতির জন্য শাফেয়ী, মালেকি বা হাম্বলি মাযহাবের কিতাব দেখে ফতোয়া দেওয়া বৈধ নয় (তুলনামূলক ফিকহ গবেষণা ছাড়া)। কারণ ওই কিতাবগুলোর পরিভাষা ও উসূল হানাফি মাযহাব থেকে ভিন্ন। হানাফি ফতোয়ার ক্ষেত্রে এগুলো অ-নির্ভরযোগ্য উৎস।

৪. মুতাজিলা বা ভ্রান্ত ফেরকার কিতাব (كتب أهل الأهواء): মুতাজিলা, শিয়া বা অন্যান্য ভ্রান্ত আকিদার লোকেরা অনেক সময় ফিকহী কিতাব লিখেছে। যেমন— জাসসাসের তাফসির বা যামাখশারির কিতাব। যদিও তারা বড় আলেম ছিলেন, কিন্তু তাদের আকিদাগত বিচ্যুতি ফিকহী মাসআলায় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই যাচাই ছাড়া তাদের কিতাব ফতোয়ায় ব্যবহার করা অনুচিত।

৫. সংক্ষিপ্তসার বা অস্পষ্ট কিতাব (المختصرات المخلة): কিছু কিতাব এত বেশি সংক্ষিপ্ত (Mukhtasar) করা হয়েছে যে, এর ফলে মাসআলার মূল উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এমন কিতাব পড়ে মুফতি ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে। তাই এগুলো ফতোয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য নয়।

প্রমাণ ছাড়া ফতোয়া দেওয়ার বিধান (حكم الإفتاء بها): অ-নির্ভরযোগ্য কিতাবে বর্ণিত মাসআলার ওপর ভিত্তি করে, কোনো দলিল বা প্রমাণ (বুরহান) ছাড়া ফতোয়া প্রদান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে **হারাম এবং নাজায়েজ**।

- **মিথ্যা আরোপের শামিল:** নির্ভরযোগ্য কিতাব ছাড়া ফতোয়া দেওয়া মানে হলো আল্লাহর বিধান সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কথা বলা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা আল্লাহর ওপর এমন কথা বলো না, যা তোমরা জানো না।"

- **ভুল হওয়ার প্রবল আশঙ্কা:** অ-নির্ভরযোগ্য কিতাবে প্রায়শই মাযহাবের মানসুখ (রহিত) বা মারজুহ (প্রত্যাখ্যাত) মত থাকে। মুফতি যদি তা যাচাই না করে ফতোয়া দেন, তবে তিনি মানুষকে ভুলের পথে পরিচালনা করবেন।

- **শর্তসাপেক্ষে বৈধতা:** তবে যদি কোনো দক্ষ ও বিজ্ঞ মুফতি (যিনি ফকিহুন নাফস) অ-নির্ভরযোগ্য কিতাবের কোনো মাসআলা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা বা উসুলের ভিত্তিতে সঠিক প্রমাণ করতে পারেন, তবেই কেবল তা উল্লেখ করা যাবে। কিন্তু সাধারণ মুফতির জন্য তা নিষিদ্ধ।

আল্লামা শামী (রহ.)-এর সতর্কতা: আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) বলেন, "মুফতির জন্য আবশ্যক হলো সে যেন জানে কোথা থেকে ফতোয়া নিচ্ছে। যে

কিতাব বা বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নয়, তার ওপর ভিত্তি করা মানে অন্ধকারের মধ্যে কাঠ কুড়ানোর মতো (হাতিবু লাইল)।"

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, কিতাব ছাপা হলেই তা ফতোয়ার জন্য যোগ্য হয় না। মুফতিকে অবশ্যই বাছ-বিচার করতে হবে। অ-নির্ভরযোগ্য কিতাব বর্জন করা এবং নির্ভরযোগ্য কিতাব (যেমন— হিদায়া, শামী, আলমগীরী) আঁকড়ে ধরাই হলো সঠিক ফতোয়া প্রদানের পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন-৩৫: বিরোধ দেখা দিলে হানাফী পরিভাষা "আল-আসাহ" এবং "আর-রাজীহ"-এর তাৎপর্য স্পষ্ট কর।

(وضح دلالة المصطلح الحنفي "الأصح" و"الراجح" عند التعارض.)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি ফিকহের কিতাবসমূহে একটি মাসআলায় একাধিক মতামত বা রিওয়ায়াত (বর্ণনা) থাকলে মুফতিকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য 'তারজিহ' বা অগ্রাধিকার দিতে হয়। এই অগ্রাধিকার বোঝানোর জন্য ফকিহগণ বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেন। এর মধ্যে **"আল-আসাহ" (الأصح)** এবং **"আর-রাজীহ" (الراجح)** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি পরিভাষা। যদিও বাহ্যিকভাবে দুটির অর্থ কাছাকাছি মনে হয়, কিন্তু ফিকহী ব্যবহারের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

১. "আল-আসাহ" (الأصح)-এর তাৎপর্য: ক. শাব্দিক অর্থ: 'আসাহ' শব্দটি 'সহিহ' (সঠিক)-এর সুপারলেটিভ ডিগ্রি বা ইসমে তাফজিল। এর অর্থ হলো— 'অধিকতর শুদ্ধ' বা 'সবচেয়ে সঠিক'।

খ. পারিভাষিক ব্যবহার: যখন কোনো মাসআলায় একাধিক বর্ণনা থাকে এবং সবগুলোই 'সহিহ' বা সঠিক বলে গণ্য হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে একটি বর্ণনা সনদের দিক থেকে বা মাযহাবের উসুলের দিক থেকে অন্যটির তুলনায় বেশি শক্তিশালী হয়, তখন শক্তিশালী মতটিকে 'আল-আসাহ' বলা হয়।

- **তাৎপর্য:** 'আল-আসাহ' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, এর বিপরীত মতটি 'বাতিল' বা ভুল নয়, বরং সেটিও 'সহিহ' (শুদ্ধ), কিন্তু আলোচ্য মতটি তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

- **উদাহরণ:** ইমাম কুদুরী (রহ.) বা হেদায়া প্রণেতা যদি কোনো মতের ক্ষেত্রে বলেন "হুওয়াল আসাহ" (এটিই অধিক শুদ্ধ), তবে মুফতির জন্য এর ওপর ফতোয়া দেওয়া ওয়াজিব। এর বিপরীতে আমল করা অনুচিত, যদিও বিপরীত মতটিও শুদ্ধ।

২. "আর-রাজীহ" (الراجح)-এর তাৎপর্য: ক. শাব্দিক অর্থ: 'রাজীহ' শব্দের অর্থ হলো— 'প্রাধান্যপ্রাপ্ত' বা 'ওজনে ভারী'। এর বিপরীত হলো 'মারজুহ' (প্রাধান্যহীন বা হালকা)।

খ. পারিভাষিক ব্যবহার: যখন কোনো মাসআলায় ইমামগণের মধ্যে মতভেদ হয় এবং এই মতভেদের ভিত্তি হয় 'দলিল' বা প্রমাণের শক্তি, তখন যেই মতটির দলিল শক্তিশালী হয়, তাকে 'আর-রাজীহ' বলা হয়।

- **তাৎপর্য:** 'আর-রাজীহ' পরিভাষাটি সাধারণত দলীলের (কুরআন, সুন্নাহ বা কিয়াস) মোকাবিলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যখন মুফতি বলেন "এই মতটি রাজীহ", তখন তিনি বোঝান যে, অন্য মতটির (মারজুহ) দলিল দুর্বল।

- **পার্থক্য:** 'আসাহ' শব্দটি সাধারণত মাযহাবের বর্ণনার (Riwayah) শক্তির সাথে সম্পৃক্ত, আর 'রাজীহ' শব্দটি সাধারণত দলিলের (Dirayah/Dalil) শক্তির সাথে সম্পৃক্ত।

বিরোধের সময় করণীয় (عند التعارض): ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে যদি কিতাবে 'আসাহ' এবং 'রাজীহ' শব্দ দুটি পাওয়া যায়, তবে হানাফি উসুল অনুযায়ী মুফতির করণীয় নিম্নরূপ:

১. **আসাহ-এর অগ্রাধিকার:** আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) বলেন, যদি কোনো মাসআলায় দুটি মতের একটিকে 'সহিহ' এবং অন্যটিকে 'আসাহ' বলা হয়, তবে মুফতিকে অবশ্যই 'আসাহ'-এর ওপর ফতোয়া দিতে হবে। কারণ এটি মাযহাবের রিওয়ায়াতের দিক থেকে মজবুত।

২. **রাজীহ বনাম আসাহ:** সাধারণত 'আসাহ' শব্দটি মাযহাবের অভ্যন্তরীণ বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আর 'রাজীহ' ব্যবহৃত হয় তাত্ত্বিক বিতর্কের ক্ষেত্রে। ফতোয়ার জন্য 'আসাহ' শব্দটি বেশি নির্দেশক। কারণ মুফতি (যিনি মুকাল্লিদ) দলিলের চেয়ে মাযহাবের নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ওপর বেশি নির্ভরশীল।

৩. **মুফতা বিহি:** অনেক সময় 'আসাহ' বা 'রাজীহ' শব্দের পরিবর্তে **'মুফতা বিহি'** (যার ওপর ফতোয়া) শব্দ ব্যবহার করা হয়। যদি কোথাও 'আসাহ' এক দিকে থাকে এবং 'মুফতা বিহি' অন্য দিকে থাকে, তবে 'মুফতা বিহি' প্রাধান্য পাবে। কারণ 'আসাহ' তাত্ত্বিক শক্তি বোঝায়, আর 'মুফতা বিহি' আমলযোগ্যতা বোঝায়।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, 'আল-আসাহ' এবং 'আর-রাজীহ'— উভয়টিই শক্তিশালী মতের পরিচায়ক। তবে 'আসাহ' শব্দটি অন্য মতকে সম্পূর্ণ বাতিল করে না, বরং দুর্বল করে দেয়। আর 'রাজীহ' শব্দটি দলীলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। একজন দক্ষ মুফতিকে ফতোয়া দেওয়ার সময় কিতাবের এই পরিভাষাগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়, যাতে তিনি দুর্বল মতের ওপর ফতোয়া দিয়ে না বসেন।

প্রশ্ন-৩৬: হানাফী পরিভাষায় 'মতন', 'শরাহ' ও 'হাশিয়া'-এর অর্থ কী এবং এগুলোর গুরুত্ব কী?

ما معنى "المتن" و"الشرح" و"الحاشية" في الاصطلاح الحنفي، وما أهمية كل منها؟

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি ফিকহ ও ফতোয়া শাস্ত্রের কিতাবগুলো রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পদ্ধতি বা ক্রমধারা অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিটি তিনটি প্রধান স্তরে বিভক্ত: 'মতন' (মূলপাঠ), 'শরাহ' (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) এবং 'হাশিয়া' (টীকা বা প্রান্তটীকা)। হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো বুঝতে হলে এবং সঠিক ফতোয়া বের করতে হলে এই তিনটি পরিভাষার অর্থ ও গুরুত্ব জানা মুফতির জন্য অপরিহার্য।

১. মতন (المتن) বা মূলপাঠ: ক. সংজ্ঞা: 'মতন' শব্দের আভিধানিক অর্থ— পিঠ বা শক্ত ভূমি। পারিভাষিক অর্থে, ফিকহের সেই সকল কিতাবকে 'মতন' বলা হয়, যেখানে মাসআলাগুলোকে অত্যন্ত সংক্ষেপে, দলিল-প্রমাণ ও বিস্তারিত আলোচনা ছাড়াই সূত্রাকারে উল্লেখ করা হয়। **খ. উদাহরণ:** ইমাম কুদূরী রচিত *'মুখতাসারুল কুদূরী'*, আল্লামা নাসাফী রচিত *'কানযুদ দাকায়েক'*, আল্লামা মওসিলী রচিত *'আল-মুখতার'*। **গ. গুরুত্ব:**

- **মুখস্থের সুবিধা:** মতনগুলো খুব সংক্ষিপ্ত ভাষায় লেখা হয় যাতে ছাত্ররা সহজে মাসআলাগুলো মুখস্থ করতে পারে।

- **মাযহাবের ভিত্তি:** মতনের কিতাবগুলোতে সাধারণত কেবল 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত মতগুলো স্থান পায়। তাই ফতোয়ার ক্ষেত্রে মতনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, যদি শরাহ ও মতনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে সাধারণত মতনের কথাই ধর্তব্য হয়, কারণ মতন মাযহাব সংরক্ষণের জন্য রচিত।

২. শরাহ (الشرح) বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ: ক. সংজ্ঞা: 'শরাহ' অর্থ উন্মোচন করা বা ব্যাখ্যা করা। মতনের সংক্ষিপ্ত ও কঠিন শব্দগুলোকে বুঝিয়ে বলা, অস্পষ্টতা দূর করা এবং মাসআলার দলিল ও কারণ (ইলাল) উল্লেখ করে যে কিতাব রচিত হয়, তাকে 'শরাহ' বলা হয়। **খ. উদাহরণ:** *'কানযুদ দাকায়েক'*-এর শরাহ হলো *'তাবয়িনুল হাকায়েক'*। *'আল-মুখতার'*-এর শরাহ হলো *'আল-ইখতিয়ার'*। *'বিদায়াতুল মুবতাদী'*-এর শরাহ হলো বিখ্যাত *'হিদায়া'*। **গ. গুরুত্ব:**

- **মাসআলা স্পষ্টকরণ:** মতন পড়ে অনেক সময় মাসআলার পূর্ণ চিত্র বোঝা যায় না, শরাহ সেই চিত্র স্পষ্ট করে।

- **দলিল জানা:** মুফতিকে ফতোয়ার দলিল জানতে হলে শরাহ দেখতে হয়।

- **মতভেদ উল্লেখ:** শরাহ কিতাবগুলোতে ইমামদের মতভেদ এবং তারজিহ (কোনটি শক্তিশালী) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকে।

৩. হাশিয়া (الحاشية) বা টীকা/প্রান্তটীকা: ক. সংজ্ঞা: 'হাশিয়া' অর্থ কিনারা বা প্রান্ত। কোনো শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে যখন পরবর্তী কোনো আলেম আরো গভীর ও সূক্ষ্ম আলোচনা করেন, জটিল বিষয়গুলো সমাধান করেন এবং লেখকের ভুলত্রুটি সংশোধন করেন, তখন তাকে 'হাশিয়া' বলা হয়। এটি সাধারণত কিতাবের পৃষ্ঠার চারপাশে বা নিচে লেখা থাকে। **খ. উদাহরণ:** *'হিদায়া'*-এর ওপর লিখিত হাশিয়া *'ইনায়াহ'* বা *'ফাতহুল কাদির'* (এটি শরাহ হলেও হাশিয়ার মতো কাজ করে)। সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হলো *'দুররুল মুখতার'*-এর ওপর আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী রচিত *'রদ্দুল মুহতার'* বা *'ফতোয়ায়ে শামী'*। **গ. গুরুত্ব:**

- **চুলচেরা বিশ্লেষণ:** হাশিয়াতে মাসআলার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়।

- **চূড়ান্ত ফয়সালা:** পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ থাকলে হাশিয়াকার তার সমাধান দেন। যেমন— আল্লামা শামী তাঁর হাশিয়ায় হাজার হাজার মাসআলার চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়েছেন।

- **আধুনিক প্রয়োগ:** সমসাময়িক সমস্যার সাথে মূল মাসআলার সম্পর্ক হাশিয়ায় আলোচনা করা হয়।

পারস্পরিক সম্পর্ক ও ফতোয়ায় ব্যবহার: মুফতির জন্য এই তিনটির সম্পর্ক অনেকটা 'গাছ'-এর মতো। 'মতন' হলো গাছের শেকড় বা মূল কাণ্ড, যা মাসআলার ভিত্তি। 'শরাহ' হলো গাছের ডালপালা, যা মাসআলাকে বিস্তৃত করে। আর 'হাশিয়া' হলো গাছের পাতা ও ফল, যা বিষয়টিকে পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর করে তোলে। ফতোয়া দেওয়ার সময় মুফতি প্রথমে মতনের দিকে তাকান মূল হুকুম জানতে, এরপর শরাহ দেখেন দলিল বুঝতে, এবং শেষে হাশিয়া দেখেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও সতর্কতা জানতে।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, 'মতন', 'শরাহ' ও 'হাশিয়া'—ফিকহী কিতাবের এই তিন স্তর হানাফি মাযহাবের এক বিশাল ঐশ্বর্য। সঠিক ও নির্ভরযোগ্য ফতোয়া প্রদানের জন্য মুফতিকে এই তিন স্তরের কিতাবের ওপরই পর্যায়ক্রমে নজর রাখতে হয়।

প্রশ্ন-৩৭: হানাফী ফিকহের কিতাবসমূহে 'আশ-শাইখান' ও 'আত-ত্বারফান' দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য কী?

(ما هو مرادهم بـ "الشيخان" و"الطرفان" في كتب الفقه الحنفي؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরিয়তের বিভিন্ন শাস্ত্রে একই পরিভাষা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। হানাফি ফিকহের কিতাবগুলোতে ইমামদের নাম সংক্ষেপে উল্লেখ করার জন্য বিশেষ কিছু উপাধি বা লকব ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে **'আশ-শাইখান' (الشيخان)** এবং **'আত-ত্বারফান' (الطرفان)** সর্বাধিক প্রচলিত। হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষার সাথে যাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়, সেজন্য হানাফি মুফতির জন্য এই পরিভাষাগুলোর সঠিক উদ্দেশ্য জানা অপরিহার্য।

১. আশ-শাইখান (الشيخان) - দুই শায়খ বা দুই মহান নেতা:

ক. হানাফি ফিকহে উদ্দেশ্যঃ হানাফি ফিকহের কিতাবে যখন 'আশ-শাইখান' বা 'শাইখাইন' বলা হয়, তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন— ১. মাযহাবের ইমাম, ইমামুল আজম **আবূ হানীফা (রহ.)** [মৃতঃ ১৫০ হি.]। ২. তাঁর প্রধান ছাত্র ও প্রধান বিচারপতি, ইমাম **আবূ ইউসুফ (রহ.)** [মৃতঃ ১৮২ হি.]।

খ. নামকরণের কারণঃ ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ এবং প্রবীণ ছাত্র। ইলম, বয়স এবং বিচারকার্য পরিচালনার অভিজ্ঞতায় তিনি ছিলেন অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী। এজন্য উস্তাদ (আবু হানিফা) এবং প্রধান ছাত্রকে (আবু ইউসুফ) সম্মানসূচকভাবে একত্রে 'শাইখাইন' বা 'দুই মুরুব্বি' বলা হয়।

গ. বিভ্রান্তি নিরসনঃ

- **হাদিস শাস্ত্রেঃ** 'শাইখাইন' বলতে ইমাম **বুখারী ও ইমাম মুসলিম**-কে বোঝায়।
- **সাহাবা যুগেঃ** 'শাইখাইন' বলতে হযরত **আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)**-কে বোঝায়।
- কিন্তু ফিকহের কিতাবে (যেমন- হিদায়া, কুদুরী) এটি কেবল আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর জন্য খাস।

২. আত-ত্বারফান (الطرفان) - দুই প্রান্ত বা দুই দিকঃ

ক. হানাফি ফিকহে উদ্দেশ্যঃ হানাফি কিতাবে যখন 'আত-ত্বারফান' বা 'ত্বারফাইন' বলা হয়, তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন— ১. উস্তাদ **ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)**। ২. তাঁর কনিষ্ঠ ছাত্র **ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (রহ.)** [মৃতঃ ১৮৯ হি.]।

খ. নামকরণের কারণঃ 'ত্বারফ' শব্দের অর্থ প্রান্ত বা কিনারা। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হলেন হানাফি ফিকহের শুরুর প্রান্ত (উস্তাদ), আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) হলেন সেই ফিকহ সংকলনের শেষ প্রান্ত (যিনি কিতাবগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন)। মাঝখানে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থাকলেও, উস্তাদ এবং কনিষ্ঠ ছাত্রের (যিনি মাযহাবের লেখক) মতের মিল বোঝাতে 'ত্বারফান' বা 'দুই প্রান্ত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

গ. ফতোয়ায় এর প্রয়োগ: সাধারণত কোনো মাসআলায় যদি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) উস্তাদ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে একমত হন, তখন ফকিহগণ বলেন: **"এ ব্যাপারে 'ত্বারফাইন'-এর ঐকমত্য রয়েছে।"** হানাফি মাযহাবের উসুল হলো—যদি 'ত্বারফাইন' (ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ) একমত হন, তবে সাধারণত ফতোয়া তাঁদের মতের ওপরই দেওয়া হয়, যতক্ষণ না ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর পক্ষে বিচারিক কোনো বিশেষ দলিল থাকে।

তুলনামূলক ছক:

পরিভাষা	অন্তর্ভুক্ত ইমামগণ	বৈশিষ্ট্য
আশ-শাইখান (দুই শায়খ)	ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ	উস্তাদ ও প্রধান ছাত্র। মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়।
আত-ত্বারফান (দুই প্রান্ত)	ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ	উস্তাদ ও লেখক ছাত্র। ফতোয়ার ক্ষেত্রে এদের ঐকমত্য অত্যন্ত শক্তিশালী।

সাহিবাইন (الصاحبان): প্রাসঙ্গিকভাবে আরেকটি পরিভাষা জানা জরুরি, তা হলো **'সাহিবাইন'** (দুই সঙ্গী)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন— ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)। যখন তাঁরা উস্তাদ আবু হানিফার সাথে দ্বিমত করেন, তখন বলা হয় "সাহিবাইন বলেছেন..."।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, হানাফি ফিকহের কিতাবগুলো সংক্ষিপ্ত ইশারায় ভরা। 'আশ-শাইখান' দ্বারা মাযহাবের প্রবীণ দুই ব্যক্তিত্বকে এবং 'আত-ত্বারফান' দ্বারা উস্তাদ ও সংকলককে বোঝানো হয়। ফতোয়া প্রদানের সময় মতভেদ নিরসনে এবং কার মতটি গ্রহণ করা হবে তা নির্ধারণে এই পরিভাষাগুলো চাবিকাঠির ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-৩৮: যে উক্তি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দিকে সম্পর্কিত, কিন্তু দুর্বল বর্ণনার মাধ্যমে এসেছে, তার সাথে কীভাবে আচরণ করা হয়?
(كيف يتم التعامل مع القول المنسوب لأبي حنيفة ولكن برواية ضعيفة؟)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি মাযহাবের ভিত্তি হলো ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ইজতেহাদ ও ফতোয়া। তবে ইমামের নামে বর্ণিত সকল উক্তি বা মাসআলা সমান শক্তিশালী নয়। বর্ণনার সূত্রের (সনদ) দিক থেকে কিছু উক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী (যাহিরুর রিওয়ায়াহ), আবার কিছু উক্তি দুর্বল সূত্রে বর্ণিত। একজন মুফতি যখন ইমামের দিকে সম্পৃক্ত কোনো দুর্বল বর্ণনা পান, তখন তার সাথে কী আচরণ করবেন—এ বিষয়ে হানাফি উসূলে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

দুর্বল বর্ণনার পরিচয় (تعريف الرواية الضعيفة): দুর্বল বর্ণনা বলতে এমন মাসআলা বা উক্তিকে বোঝায়, যা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে 'মুতাওয়াতির' বা 'মাশহুর' সনদে বর্ণিত হয়নি। বরং তা 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনা) হিসেবে অথবা কোনো অপরিচিত বা দুর্বল রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সাধারণত 'গায়ের যাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা 'নাওয়াদির'-এর কিতাবে পাওয়া যায়।

দুর্বল বর্ণনার সাথে আচরণের নীতিমালা (كيفية التعامل):

১. সাধারণ বিধান: বর্জন করা (الأصل هو الترك): হানাফি মাযহাবের সাধারণ মূলনীতি হলো, যদি কোনো উক্তি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দিকে নিসবত (সম্পৃক্ত) করা হয় কিন্তু তার সনদ দুর্বল হয় এবং তার বিপরীতে শক্তিশালী সনদ (যাহিরুর রিওয়ায়াহ) থাকে, তবে দুর্বল বর্ণনাটি **প্রত্যাখ্যাত** হবে।

- **কারণ:** মাযহাবের ভিত্তি মজবুত প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দুর্বল প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিলে মাযহাবের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই মুফতির জন্য সরাসরি এ ধরনের উক্তির ওপর ফতোয়া দেওয়া জায়েজ নেই।

২. যাচাই ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ (التحقيق والمقارنة): মুফতি দুর্বল বর্ণনাটি পাওয়ার পর তা 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর সাথে মিলিয়ে দেখবেন।

- যদি দুর্বল বর্ণনাটি যাহিরুর রিওয়ায়াহ-এর সম্পূর্ণ বিপরীত হয়, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

- যদি যাহিরুর রিওয়ায়াহতে ওই বিষয়ে কোনো আলোচনা না থাকে, তবে দুর্বল বর্ণনাটি বিবেচনা করার সুযোগ তৈরি হয়।

৩. মাশায়েখগণের অনুমোদন বা 'তাসহিহ' (تصحيح المشايخ): দুর্বল বর্ণনার ওপর আমল বা ফতোয়া দেওয়ার একমাত্র বৈধ পথ হলো 'আসহাবুত তারজিহ' বা মাযহাবের পরবর্তী বড় ফকিহগণের অনুমোদন।

- **নীতিমালা:** যদি আল্লামা কুদুরী, হেদায়া প্রণেতা আল্লামা মারগীনানী বা কাযী খান (রহ.)-এর মতো মুজতাহিদ ফকিহগণ কোনো দুর্বল বর্ণনাকে দলীলের ভিত্তিতে বা যুগের প্রয়োজনে 'সহিহ' বা 'গ্রহণযোগ্য' বলে রায় দেন, তবে সেটি আর দুর্বল থাকে না। তখন সেটি 'মুতামাদ' বা নির্ভরযোগ্য হয়ে যায়।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি 'ইস্তিসনা' (অর্ডার দিয়ে পণ্য তৈরি)-কে জায়েজ বলেছেন। যদিও কিয়াসের দৃষ্টিতে এটি নাজায়েজ ছিল, কিন্তু পরবর্তী ফকিহগণ মানুষের ব্যাপক প্রয়োজনেই ইমামের এই দুর্বল বর্ণনাটিকেই ফতোয়ার জন্য গ্রহণ করেছেন।

৪. সতর্কতার সাথে উদ্ধৃতি প্রদান: মুফতি যখন কিতাবে এমন বর্ণনা দেখবেন, তখন তিনি লক্ষ্য করবেন লেখক কী শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদি লেখক **"ইমাম থেকে বর্ণিত আছে"** (রুইয়া আন...) বা **"বলা হয়ে থাকে"** (ক্বীলা) শব্দ ব্যবহার করেন, তবে বুঝতে হবে এটি দুর্বল। আর যদি **"তিনি বলেছেন"** (ক্বালা) ব্যবহার করেন, তবে তা শক্তিশালী। দুর্বল শব্দ দেখলে মুফতি সতর্ক হবেন এবং অন্য নির্ভরযোগ্য কিতাব (যেমন—শামী বা আলমগীরী) যাচাই করবেন।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দিকে সম্পৃক্ত হলেই কোনো কথা চোখ বন্ধ করে মানা যায় না। 'আহলিইয়াত' বা যোগ্যতা সম্পন্ন মুফতি ছাড়া কেউ দুর্বল বর্ণনার ওপর ফতোয়া দিতে পারেন না। সাধারণ মুফতিদের জন্য ওয়াজিব হলো দুর্বল বর্ণনা এড়িয়ে চলা এবং মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী মতের (যাহিরুর রিওয়ায়াহ) অনুসরণ করা।

প্রশ্ন-৩৯: তাদের উক্তি: ফুলান বলেছেন- (قال فلان) (রাবী আন ফালান থেকে বর্ণিত হয়েছে)-এর অর্থ কী? তারজীহ (অগ্রাধিকার)-এ এর তাৎপর্য কী? (ما معنى قولهم: "قال فلان" أو "روي عن فلان"؟ وما دلالته في الترجيح؟)

ভূমিকা (مقدمة): ফিকহী কিতাবসমূহে মুজতাহিদ ও লেখকগণ মাসআলা বর্ণনা করার সময় বিশেষ কিছু শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করেন। এই শব্দগুলো কেবল বাক্য গঠনের জন্য নয়, বরং এর মাধ্যমে বর্ণিত মাসআলাটির শক্তি বা দুর্বলতা নির্দেশ করা হয়। হানাফি ফিকহে **"ক্বালা ফুলান" (قال فلان)** এবং **"রুইয়া আন ফুলান" (روي عن فلان)**—এই দুটি শব্দবন্ধের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। সঠিক ফতোয়া (তারজিহ) দেওয়ার জন্য মুফতিকে এই পার্থক্য বুঝতে হয়।

১. "ক্বালা ফুলান" (قال فلان)-এর অর্থ ও তাৎপর্য: ক. শাব্দিক অর্থ: "অমুক বলেছেন"। এটি কর্তৃবাচ্য (Active Voice) বা 'সিগায়ে মারুফ'। **খ. পারিভাষিক অর্থ:** লেখক যখন কোনো মুজতাহিদের উক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে নিশ্চিত ভাষায় বলেন "ইমাম আবু হানিফা বলেছেন...", তখন একে **'সিগায়ে জাজম'** (নিশ্চয়তার শব্দ) বলা হয়। **গ. তাৎপর্য:**

- এর অর্থ হলো, লেখক নিশ্চিত যে এই উক্তিটি ওই ইমাম থেকেই প্রমাণিত এবং এটি তাঁর নির্ভরযোগ্য মত।
- এটি ফতোয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী দলিল হিসেবে গণ্য হয়। মুফতি এর ওপর ভিত্তি করে নির্দ্বিধায় ফতোয়া দিতে পারেন।

২. "রুইয়া আন ফুলান" (روي عن فلان) বা "ক্বীলা" (قيل)-এর অর্থ ও তাৎপর্য: ক. শাব্দিক অর্থ: "অমুক থেকে বর্ণিত হয়েছে" বা "বলা হয়েছে"। এটি কর্মবাচ্য (Passive Voice) বা 'সিগায়ে মাজহুল'। **খ. পারিভাষিক অর্থ:** লেখক যখন নিশ্চিত নন অথবা বর্ণনাটি দুর্বল মনে করেন, তখন তিনি এই শব্দ ব্যবহার করেন। একে **'সিগায়ে তামরীদ'** (দুর্বলতা বা অসুস্থতার শব্দ) বলা হয়। **গ. তাৎপর্য:**

- এর অর্থ হলো, এই বর্ণনার সনদে দুর্বলতা আছে অথবা এটি ইমামের নির্ভরযোগ্য মত নয়। লেখক এর দায়ভার নিতে চাচ্ছেন না।

- ফতোয়ার ক্ষেত্রে এটি দুর্বল হিসেবে গণ্য হয়। এর বিপরীতে যদি শক্তিশালী কোনো মত থাকে, তবে এটিকে বর্জন করা হয়।

তারজিহ বা অগ্রাধিকা প্রদান-এ এর প্রভাব (دلالته في الترجيح): যখন কোনো মাসআলায় দুটি ভিন্ন মত পাওয়া যায় এবং মুফতিকে একটি বেছে নিতে হয়, তখন এই পরিভাষাগুলো নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে।

- **অগ্রাধিকারের নিয়ম:** যদি একটি মতের ক্ষেত্রে **"ক্বালা" (তিনি বলেছেন)** এবং অন্য মতের ক্ষেত্রে **"রুইয়া" (বর্ণিত আছে)** শব্দ ব্যবহৃত হয়, তবে **"ক্বালা"** যুক্ত মতটি অগ্রাধিকার (তারজিহ) পাবে। কারণ নিশ্চয়তা (Yaqeen) সন্দেহের (Shakk) চেয়ে উত্তম।

- **উদাহরণ:** 'হিদায়া' গ্রন্থে আল্লামা মারগীনানী (রহ.) প্রায়ই হানাফি মাযহাবের শক্তিশালী মত বর্ণনায় "ক্বালা" ব্যবহার করেন। আর দুর্বল বা অন্য মাযহাবের মত বর্ণনায় "ক্বীলা" বা "রুইয়া" ব্যবহার করেন। মুফতি এই শব্দ দেখেই বোঝেন কোনটি 'মুতামাদ' (নির্ভরযোগ্য) আর কোনটি 'গায়ের মুতামাদ'।

ব্যতিক্রম: কখনো কখনো ছন্দের প্রয়োজনে বা ভাষাসৌন্দর্যের জন্য মাজহুল শব্দ ব্যবহার হতে পারে, তবে ফিকহের উসুল অনুযায়ী সাধারণ নিয়ম হলো— মাজহুল বা প্যাসিভ শব্দ দুর্বলতার আলামত।

উপসংহার (خاتمة): একজন মুফতি কেবল মাসআলা পড়েন না, তিনি শব্দের গাঁথুনিও বিশ্লেষণ করেন। "ক্বালা" এবং "রুইয়া"-এর এই পার্থক্য জানা মুফতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে তিনি সবল ও দুর্বল মতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন এবং মানুষকে সঠিক ফতোয়া প্রদান করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন-৪০: হানাফীদের এমন চারটি পরিভাষা উল্লেখ কর যা উক্তির শক্তি ও তদনুযায়ী আমল করার ইঙ্গিত দেয়।
(اذكر أربعة من "مصطلحات الحنفية" التي تفيد قوة القول والعمل به.)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি মাযহাবে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুফতিকে অবশ্যই সবচেয়ে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মতটি (Mufta Bihi) বেছে নিতে হয়। ফকিহগণ কিতাবের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট পরিভাষা (Terminologies) ব্যবহার

করে ভবিষ্যৎ মুফতিদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মতটি শক্তিশালী এবং আমলযোগ্য। সিলেবাস ও 'শরহু উকুদি রসমিল মুফতি' কিতাবের আলোকে এমন চারটি প্রধান পরিভাষা নিচে আলোচনা করা হলো।

উক্তির শক্তি নির্দেশক চারটি পরিভাষা:

১. আলাইহিল ফতোয়া (عليه الفتوى):

- **অর্থ:** "এর ওপরই ফতোয়া (প্রদত্ত হয়)।"
- **তাৎপর্য:** এটি ফতোয়ার শক্তি নির্দেশের **সবচেয়ে শক্তিশালী শব্দ**। যখন ফকিহগণ কোনো মাসআলার শেষে এই শব্দটি লেখেন, তখন মুফতির জন্য অন্য কোনো মতের দিকে তাকানো বা গবেষণা করার প্রয়োজন থাকে না। এটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।
- **উদাহরণ:** আল্লামা শামী (রহ.) বা কাজিখান (রহ.) যখন বলেন, "এই মতটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং 'আলাইহিল ফতোয়া'", তখন এটি মাযহাবের অফিশিয়াল রায় হিসেবে গণ্য হয়।

২. আলাইহিল আমাল (عليه العمل):

- **অর্থ:** "এর ওপরই আমল (বাস্তবায়িত) আছে।"
- **তাৎপর্য:** এই পরিভাষাটি নির্দেশ করে যে, বিষয়টি কেবল তাত্ত্বিকভাবে শক্তিশালী নয়, বরং সামাজিকভাবে বা বিচারালয়ে (Court) যুগ যুগ ধরে এই মতের ওপরই আমল করা হচ্ছে। উরফ বা প্রথার কারণে অনেক সময় কিয়াসের বিরোধী মতকেও এই শব্দের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয়।
- **প্রয়োগ:** মুফতি যখন দেখেন কোনো মতে 'আলাইহিল আমাল' লেখা আছে, তখন তিনি বোঝেন যে এটি মানুষের জন্য সহজ এবং প্রচলিত। তাই তিনি এর ওপর ফতোয়া দেন।

৩. হুওয়াস সহীহ / আল-আসাহ (هو الصحيح / الأصح):

- **অর্থ:** "এটিই সহিহ (শুদ্ধ)" বা "এটিই অধিকতর শুদ্ধ"।
- **তাৎপর্য:** এই পরিভাষাটি বর্ণনার (Riwayah) বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে।

- **হুওয়াস সহীহ:** এর দ্বারা বোঝা যায় যে, এই মতটি ইমাম থেকে সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এটি ভুল নয়।
- **আল-আসাহ:** এটি নির্দেশ করে যে, মাসআলায় একাধিক সঠিক মত আছে, কিন্তু আলোচ্য মতটি সনদের দিক থেকে বা মাযহাবের উসূলের দিক থেকে **সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী**। মতভেদের সময় মুফতি 'সহিহ'-এর চেয়ে 'আসাহ' মতকে অগ্রাধিকার দেন।

৪. হুওয়াল মুখতার / আল-মুখতার লিল-ইফতা (هو المختار / المختار للإفتاء):

- **অর্থ:** "এটিই মনোনীত" বা "ফতোয়ার জন্য এটিই নির্বাচিত"।
- **তাৎপর্য:** অনেক সময় দলিলের দিক থেকে একটি মত শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু মানুষের সুবিধা, যুগের চাহিদা বা প্রয়োজনের (জরুরত) কারণে ফকিহগণ অন্য একটি মতকে 'বেছে' নেন। এই নির্বাচনকে বোঝাতে 'আল-মুখতার' শব্দ ব্যবহার করা হয়।
- **প্রয়োগ:** বিশেষ করে 'নাওয়াজিল' বা নতুন সমস্যার ক্ষেত্রে এবং সাধারণ মানুষের জন্য সহজীকরণের (Taysir) ক্ষেত্রে এই পরিভাষাটি ফতোয়ার যোগ্যতা নির্দেশ করে।

ক্রমধারা (Hierarchy): যদিও এই শব্দগুলো সবই শক্তির নির্দেশক, তথাপি এদের মধ্যে সূক্ষ্ম স্তরবিন্যাস আছে। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.)-এর মতে, সাধারণত **'আলাইহিল ফতোয়া'** শব্দটি অন্য সবগুলোর চেয়ে অগ্রগণ্য। এরপর **'আলাইহিল আমাল'**, এরপর **'আসাহ'**, এবং এরপর **'সহিহ'** বা **'মুখতার'**।

উপসংহার (خاتمة): মুফতির দায়িত্ব হলো ফতোয়ার কিতাবের সাগরে ডুব দিয়ে মুক্তা খুঁজে আনা। উল্লিখিত চারটি পরিভাষা (আলাইহিল ফতোয়া, আলাইহিল আমাল, আসাহ, মুখতার) হলো সেই মুক্তা চেনার উপায়। এই শব্দগুলো যেখানে থাকে, সেখানেই মাযহাবের নির্ভরযোগ্যতা থাকে। মুফতিকে অবশ্যই এই পরিভাষাগুলোর ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিতে হবে, নিজের খেয়ালখুশি মতো নয়।

তারজীহের মূলনীতি

প্রশ্ন-৪১: বিভিন্ন বর্ণনার ক্ষেত্রে হানাফী মুফতী যে মৌলিক 'তারজীহের মূলনীতি'-এর উপর নির্ভর করেন, তা কী কী?

(ما هي "قواعد الترجيح" الأساسية التي يعتمد عليها المفتي الحنفي عند اختلاف الروايات؟)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি মাযহাব একটি সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ ফিকহী স্কুল। মাসআলা বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমামগণের (ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ) বিভিন্ন মতামত বা একাধিক রিওয়ায়াত (বর্ণনা) পাওয়া যায়। মুফতির জন্য সব বর্ণনার ওপর একসাথে আমল করা সম্ভব নয়। তাই সঠিক ফতোয়া প্রদানের জন্য একটি শক্তিশালী মতকে গ্রহণ করতে হয় এবং অন্যগুলোকে ছাড়তে হয়। একেই 'তারজীহ' বা অগ্রাধিকার বলা হয়। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) তাঁর 'শরহু উকুদি রসমিল মুফতি' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত মূলনীতি বর্ণনা করেছেন।

তারজীহের সংজ্ঞা (تعريف الترجيح): ১. আভিধানিক অর্থ: তারজীহ শব্দের অর্থ হলো— এক পাল্লাকে অন্য পাল্লার ওপর ভারী করা বা প্রাধান্য দেওয়া। **২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"পরস্পর বিরোধী দুটি দলিলের মধ্যে একটিকে অপরটির তুলনায় শক্তিশালী সাব্যস্ত করা, যাতে শক্তিশালী দলিলের ওপর আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়।"

হানাফী মুফতির মৌলিক তারজীহের মূলনীতিসমূহ (قواعد الترجيح الأساسية): একজন হানাফি মুফতি ফতোয়া প্রদানের সময় মতভেদ নিরসনে নিম্নোক্ত ক্রমধারা বা মূলনীতিগুলো অনুসরণ করেন:

১. বর্ণনার স্তরের ওপর ভিত্তি করে (الترجيح بقوة الرواية): হানাফি মাযহাবে মাসআলাগুলো তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। মুফতিকে এই ক্রম মেনে চলতে হয়:

- **প্রথমত:** 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' (ظاهر الرواية)-এর মাসআলা। এটি মাযহাবের ভিত্তি। অন্য কোনো বর্ণনা এর মোকাবেলা করতে পারে না।
- **দ্বিতীয়ত:** যদি যাহিরুর রিওয়ায়াতে সমাধান না থাকে, তবে 'মাসায়িলুন নাওয়াদির' (مسائل النوادر) গ্রহণ করা হয়।

- **তৃতীয়তঃ** যদি সেখানেও না থাকে, তবে 'মাসায়িলুল ওয়াকিয়াত' বা ফতোয়ার কিতাব দেখা হয়।

২. ইমামগণের মতামতের ক্রমধারা (الترتيب بين أقوال الأئمة): যদি 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর ভেতরেই ইমামদের মতভেদ থাকে, তবে সাধারণ নিয়ম হলো:

- সর্বাগ্রে ইমামুল আজম **আবু হানিফা (রহ.)**-এর মত প্রাধান্য পাবে। কারণ তিনিই মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা (আসল)।
- অতঃপর ইমাম **আবু ইউসুফ (রহ.)**-এর মত।
- অতঃপর ইমাম **মুহাম্মদ (রহ.)**-এর মত।
- অতঃপর ইমাম **জুফার (রহ.)** ও **হাসান ইবনে জিয়াদ (রহ.)**-এর মত।

৩. মুফতা বিহি কওলের অনুসরণ (اتباع القول المفتى به): যদি পরবর্তী যুগের ফকিহগণ বা 'আসহাবুত তারজিহ' (যেমন— ইমাম কুদুরী, হেদায়া প্রণেতা, কাজিখান) বিশেষ কোনো কারণবশত ইমাম আবু হানিফার মত রেখে ইমাম আবু ইউসুফ বা ইমাম মুহাম্মদের মতকে 'মুফতা বিহি' (ফতোয়াযোগ্য) সাব্যস্ত করেন, তবে মুফতির জন্য সেই 'মুফতা বিহি' কওলের অনুসরণ করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে ইমামের ব্যক্তিগত মতের চেয়ে মাযহাবের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত (Collective Decision) অগ্রাধিকার পায়।

৪. বিচারিক ও মিরাস সংক্রান্ত বিষয় (القضاء والمواريث): বিষয়ভেদে অগ্রাধিকারের নীতি পরিবর্তিত হয়:

- বিচার ব্যবস্থা ও সাক্ষ্য আইনের ক্ষেত্রে ইমাম **আবু ইউসুফ (রহ.)**-এর মত প্রাধান্য পায় (অভিজ্ঞতার কারণে)।
- উত্তরাধিকার ও যাবিউল আরহামের ক্ষেত্রে ইমাম **মুহাম্মদ (রহ.)**-এর মত প্রাধান্য পায়।

৫. যুগের চাহিদা ও উরফ (مراعاة الزمان والعرف): যদি ইমামদের মতভেদ দলীলের ভিত্তিতে না হয়ে তৎকালীন প্রথার ভিত্তিতে হয়, তবে মুফতি বর্তমান যুগের প্রথা বা 'উরফ' অনুযায়ী যেই ইমামের মতটি মানুষের জন্য কল্যাণকর,

তাকে তারজীহ দেবেন। একে বলা হয়— *"যুগের পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তন।"*

৬. সহজীকরণ ও সতর্কতা (التيسير والاحتياط):

- ইবাদতের ক্ষেত্রে সাধারণত 'আহওয়াত' বা সতর্কতামূলক মত গ্রহণ করা হয়।
- মানুষের লেনদেন বা বিপদের সময় 'আইসার' বা সহজতর মত গ্রহণ করা হয় (শর্তসাপেক্ষে), যাতে মানুষ দ্বীন থেকে বিমুখ না হয়।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, হানাফি মুফতি অন্ধভাবে ফতোয়া দেন না। তিনি প্রথমে মাযহাবের মূল বর্ণনা খোঁজেন, এরপর ইমামদের মতামতের ক্রমধারা দেখেন এবং সবশেষে পরবর্তী ফকিহদের তারজীহ বা সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া প্রদান করেন। এই সুশৃঙ্খল নীতিমালাই হানাফি ফিকহকে বিশ্বজনীন করেছে।

প্রশ্ন-৪২: এ মূলনীতিটি স্পষ্ট কর : যদি যাহিরুর রিওয়ায়া-এর বর্ণনাগুলো সাংঘর্ষিক হয়, তবে ইমাম (আবু হানীফা)-এর উক্তি গ্রহণ করা অগ্রাধিকারযোগ্য।

وضح القاعدة: "إذا تعارضت روايات ظاهر الرواية فالأخذ بقول الإمام أولى".)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি মাযহাবের ফতোয়া প্রদান পদ্ধতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইজতেহাদের প্রতি অবিচল আস্থা। যখন মাযহাবের সবচেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনা অর্থাৎ 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর ভেতরে ইমাম এবং তাঁর ছাত্রদের (সাহিবাইন) মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তখন মুফতি কোন মতটি গ্রহণ করবেন— এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো: ইমামের উক্তি গ্রহণ করাই উত্তম বা অগ্রাধিকারযোগ্য।

মূলনীতিটির ব্যাখ্যা (شرح القاعدة):

১. সাধারণ বিধান (Al-Asl): এই মূলনীতির অর্থ হলো, যখন কোনো মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এক দিকে এবং তাঁর ছাত্র ইমাম আবু

ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) অন্য দিকে অবস্থান নেন, তখন সাধারণ অবস্থায় (General Rule) মুফতির জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া ওয়াজিব বা উত্তম।

- **কারণ:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হলেন মাযহাবের 'রইস' বা প্রধান। তাঁর ইজতেহাদী শক্তি, বয়োজ্যেষ্ঠতা এবং তাকওয়া সাহিবাইনের চেয়ে ঊর্ধ্বে। আল্লামা শামী বলেন, "ইমামের দলিল গোপন থাকলেও তা সাহিবাইনের প্রকাশ্য দলিলের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে।"

২. ইমামের মতের সাথে সাহিবাইনের মতের সংঘর্ষ: অনেক সময় দেখা যায়, সাহিবাইন (দুই ছাত্র) কোনো মাসআলায় একমত হয়েছেন কিন্তু উস্তাদ ভিন্ন মত দিয়েছেন। এ অবস্থায় হানাফি ফকিহদের মধ্যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে:

- কিছু ফকিহ বলেন, সাহিবাইনের ঐকমত্যকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।
- তবে **নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ মত (আল-মুতামাদ)** হলো: সাহিবাইন একমত হলেও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতই প্রাধান্য পাবে। কারণ তিনি হলেন 'উসুল' (ভিত্তি), আর ছাত্ররা হলেন অনুসারী। ভিত্তির বিপরীতে শাখার মত সাধারণত গ্রহণ করা হয় না।

ব্যতিক্রম ক্ষেত্রসমূহ (Exceptions): এই মূলনীতিটি 'আম' বা সার্বজনীন হলেও কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে, যেখানে ইমামের মতের ওপর সাহিবাইন বা অন্য ইমামের মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়:

ক. দলীলের স্পষ্ট দুর্বলতা: যদি পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণ (আসহাবুত তারজীহ) গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ইমামের মতের দলিলটি দুর্বল এবং সাহিবাইনের দলিলটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অধিক শক্তিশালী, তখন সাহিবাইনের মত গ্রহণ করা হয়। (যদিও এটি খুব বিরল)।

খ. যুগের পরিবর্তন (Change of Era): ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অনেক ফতোয়া তৎকালীন মানুষের সততা ও অবস্থার ওপর ভিত্তি করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী যুগে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটলে সাহিবাইন ভিন্ন মত দেন। এক্ষেত্রে মুফতিরা 'জরুরত' ও 'ফাসাদে যামানা' (যুগের অনাচার)-এর কারণে ইমামের মত ত্যাগ করে সাহিবাইনের মত গ্রহণ করেন।

- *উদাহরণ:* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মিথ্যা সাক্ষীর প্রকাশ্য বিচার বা শাস্তি (তাশহির) নেই। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, তাকে শাস্তি দিতে হবে। পরবর্তী ফকিহগণ ফিতনা রোধে সাহিবাইনের মতেই ফতোয়া দিয়েছেন।

গ. বিচারিক ও বিশেষ ক্ষেত্র: বিচারকার্য (Qada) পরিচালনার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর অভিজ্ঞতা বেশি থাকায় কাজি বা বিচারকরা তাঁর মতের ওপর ফতোয়া দেন, ইমাম আবু হানিফার মতের ওপর নয়।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, **"ইমামের উক্তি গ্রহণ করা অগ্রাধিকারযোগ্য"**— এটিই হানাফি মাযহাবের ডিফল্ট বা মৌলিক নিয়ম। মুফতি এই নিয়মেই চলবেন। তবে যদি মাযহাবের পরবর্তী বড় ফকিহগণ (যেমন— হেদায়া বা শামী প্রণেতা) বিশেষ কারণে অন্য মতকে 'মুফতা বিহি' ঘোষণা করেন, কেবল তখনই এই মূলনীতি থেকে সরে আসা বৈধ হবে। অন্যথায় ইমামের অনুসরণই নিরাপদ।

প্রশ্ন-৪৩: 'আলাইহিল ফতোয়া' (এ মতের উপর ফতোয়া)-এর পরিভাষাগত তাৎপর্য কী? 'আল-মুখতার লিল-ইফতা' ও এর মাঝে পার্থক্য কী? (ما دلالة مصطلح "عليه الفتوى"؟ وما الفرق بينه وبين "المختار للإفتاء"؟)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি ফিকহের কিতাবগুলোতে মাসআলার শক্তি ও আমলযোগ্যতা বোঝানোর জন্য বিভিন্ন পরিভাষা (Terminology) ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে **"আলাইহিল ফতোয়া"** (عليه الفتوى) এবং **"আল-মুখতার লিল-ইফতা"** (المختار للإفتاء) দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। মুফতির জন্য এই দুইয়ের অর্থ ও পার্থক্য জানা জরুরি, যাতে তিনি দুর্বল মতের ওপর ফতোয়া দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করেন।

১. 'আলাইহিল ফতোয়া'-এর পরিভাষাগত তাৎপর্য: ক. শাব্দিক অর্থ: 'আলাইহি' মানে 'এর ওপর' এবং 'ফতোয়া' মানে 'শরয়ী রায়'। অর্থাৎ— "এর ওপরই ফতোয়া রয়েছে।" **খ. পারিভাষিক অর্থ:** যখন ফকিহগণ কোনো মাসআলার শেষে এই শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো:

"এই মাসআলাটি মাযহাবের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং আমলযোগ্য মত। মুফতির জন্য এই মতের বাইরে গিয়ে অন্য কোনো মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া জায়েজ নেই।"

এটি সাধারণত নির্দেশ করে যে:

- মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহ এই মতের ওপর একমত।
- মানুষের আমল বা 'তাআমুল' (Practice) এই মতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।
- এটি ফতোয়া প্রদানের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

২. 'আল-মুখতার লিল-ইফতা'-এর পরিভাষাগত তাৎপর্য: ক. শাব্দিক অর্থ: 'মুখতার' অর্থ পছন্দনীয় বা মনোনীত। অর্থাৎ— "ফতোয়া দেওয়ার জন্য এটিই পছন্দ করা হয়েছে।" **খ. পারিভাষিক অর্থ:** এই পরিভাষাটি তখন ব্যবহার করা হয়, যখন কোনো মাসআলায় ইমামগণের মধ্যে একাধিক শক্তিশালী মত থাকে এবং ফকিহগণ বিশেষ কোনো কারণে (যেমন— দলিল শক্তিশালী হওয়া বা মানুষের জন্য সহজ হওয়া) একটি মতকে বেছে নেন।

- এটিও ফতোয়ার জন্য শক্তিশালী, তবে 'আলাইহিল ফতোয়া'-এর চেয়ে এর বাধ্যবাধকতা কিছুটা কম হতে পারে। এটি বোঝায় যে, অন্য মতটিও ফেলার মতো নয়, তবে এটি উত্তম।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য (الفروق بينهما):

পার্থক্যের বিষয়	আলাইহিল ফতোয়া (عليه الفتوى)	আল-মুখতার লিল-ইফতা (المختار للإفتاء)
১. শক্তির মাত্রা	এটি অধিকতর শক্তিশালী ও জোরালো। এটি অনেকটা নির্দেশের মতো।	এটিও শক্তিশালী, তবে এতে ইখতিয়ার বা পছন্দের অবকাশ থাকে।
২. ব্যবহারের ক্ষেত্র	সাধারণত যখন কোনো মতের ওপর উম্মাহর আমল বা 'উরফ' প্রতিষ্ঠিত	যখন দলীলের ভিত্তিতে বা সহজীকরণের (Taysir) জন্য কোনো মতকে বাছাই করা হয়, তখন এটি ব্যবহৃত হয়।

	হয়ে যায়, তখন এটি ব্যবহৃত হয়।	
৩. বাধ্যবাধকতা	মুফতির জন্য এর বিরোধিতা করা কঠিন এবং সাধারণ অবস্থায় অবৈধ।	মুফতি বিশেষ প্রয়োজনে এর বিপরীত শক্তিশালী মত গ্রহণ করতে পারেন (যদি তিনি যোগ্য হন)।
৪. উদাহরণ	হেদায়া বা শামীতে যখন বলা হয় 'আলাইহিল ফতোয়া', তখন সেটিই শেষ কথা।	যখন বলা হয় 'আল-মুখতার', তখন বোঝা যায় এখানে ভিন্নমতও শক্তিশালী ছিল, কিন্তু ফকিহ এটাকে বেছে নিয়েছেন।

সম্পর্ক: আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) বলেন, অনেক সময় ফকিহগণ এই দুটি শব্দকে সমার্থক (Synonym) হিসেবেও ব্যবহার করেন। অর্থাৎ, উভয়টি দ্বারাই 'মুফতা বিহি' বা ফতোয়াযোগ্য মত বোঝানো হয়। তবে সূক্ষ্ম বিচারে 'আলাইহিল ফতোয়া' শব্দটি 'আল-মুখতার'-এর চেয়ে বেশি ব্যাপক এবং শক্তিশালী।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, মুফতি যখন কিতাবে **"আলাইহিল ফতোয়া"** দেখবেন, তখন তিনি চোখ বন্ধ করে সেই মতের ওপর ফতোয়া দেবেন। আর যখন **"আল-মুখতার"** দেখবেন, তখন বুঝবেন যে এটি ফকিহদের নির্বাচিত ও পছন্দনীয় মত, যার ওপর আমল করা উত্তম। এই পরিভাষাগুলো মুফতিকে ফতোয়ার গোলকধাঁধা থেকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়।

প্রশ্ন-৪৪: হানাফী মাযহাবে মাসআলায় শুদ্ধতা প্রমাণ ও নির্ভরতা নির্দেশকারী তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা উল্লেখ কর।

اذكر ثلاثة من أهم المصطلحات التي تفيد تصحيح المسألة واعتمادها في المذهب الحنفي.)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি ফিকহের বিশাল ভাণ্ডারে একটি মাসআলায় একাধিক মতামত থাকা স্বাভাবিক। এই মতামতগুলোর মধ্য থেকে কোনটি শক্তিশালী এবং কোনটি আমলযোগ্য, তা বোঝানোর জন্য ফকিহগণ বিশেষ কিছু পরিভাষা বা 'মুসতলাহাত' ব্যবহার করেন। এই পরিভাষাগুলো মুফতিকে সঠিক ফতোয়া

প্রদানে পথ দেখায়। নিম্নে মাসআলায় শুদ্ধতা প্রমাণ ও নির্ভরতা নির্দেশকারী তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা আলোচনা করা হলো।

১. আল-আসাহ (الأصح) - অধিকতর শুদ্ধ:

- **পরিচয়:** এটি 'সহিহ' শব্দের 'ইসমে তাফজিল' বা আধিক্যবাচক রূপ। এর অর্থ হলো— 'সবচেয়ে বিশুদ্ধ' বা 'অধিকতর সঠিক'।

- **ব্যবহারের ক্ষেত্র:** যখন কোনো মাসআলায় ইমামগণের বা মাযহাবের একাধিক বর্ণনা থাকে এবং সবগুলোই নীতিগতভাবে 'সহিহ' বা সঠিক বলে গণ্য হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে একটি বর্ণনা সনদের শক্তিতে বা মাযহাবের উসূলের বিচারে অন্যটির চেয়ে মজবুত হয়, তখন শক্তিশালী মতটিকে বোঝাতে 'আল-আসাহ' বলা হয়।

- **নির্ভরতা:** মুফতির জন্য ওয়াজিব হলো 'আল-আসাহ' মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) বলেন, যেখানে 'সহিহ' এবং 'আসাহ' উভয়টি থাকে, সেখানে 'আসাহ' অগ্রাধিকার পায়। কারণ এর বিপরীত মতটি ভুল নয়, তবে দুর্বল।

২. আলাইহিল ফতোয়া (عليه الفتوى) - এর ওপরই ফতোয়া:

- **পরিচয়:** এর শাব্দিক অর্থ হলো, ফতোয়া এর ওপরই নির্ভরশীল। এটি হানাফি মাযহাবের ফতোয়া বিভাগের চূড়ান্ত বা 'ফাইনাল অথরিটি' নির্দেশক পরিভাষা।

- **ব্যবহারের ক্ষেত্র:** যখন ফকিহগণ কোনো মাসআলায় মতভেদ বা বিতর্কের অবসান ঘটাতে চান এবং উম্মাহর আমল ও প্রয়োজকে সামনে রেখে একটি নির্দিষ্ট মতকে ফতোয়ার জন্য নির্ধারণ করেন, তখন তাঁরা বলেন— "ওয়াল ফতোয়া আলাইহি" বা "আলাইহিল ফতোয়া"।

- **নির্ভরতা:** এটি নির্ভরতার সর্বোচ্চ স্তর। যদি কিয়াস বা দলিলের বিচারে অন্য কোনো মত শক্তিশালীও হয়, তবুও 'আলাইহিল ফতোয়া' লিখিত মতটিই গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এটি মাশায়েখদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। এটি মুফতিকে ইজতেহাদের কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়।

৩. হুওয়াল মুখতার (هو المختار) - এটিই মনোনীত:

- **পরিচয়:** 'মুখতার' অর্থ হলো পছন্দনীয় বা নির্বাচিত। অর্থাৎ অসংখ্য মতের ভিড়ে ফকিহগণ এটিকেই বেছে নিয়েছেন।

- **ব্যবহারের ক্ষেত্র:** সাধারণত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মতভেদের সময় এই পরিভাষাটি বেশি ব্যবহৃত হয়। যখন দলীলের শক্তিতে অথবা মানুষের জন্য সহজীকরণের (Taysir) উদ্দেশ্যে কোনো একটি মতকে ফকিহগণ গ্রহণ করেন, তখন তাকে 'আল-মুখতার' বলা হয়।

- **নির্ভরতা:** 'আল-মুখতার' মানে হলো, অন্য মতগুলোও শক্তিশালী ছিল, কিন্তু যুগের চাহিদা বা দলীলের কারণে এটিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে 'নাওয়াজিল' বা নতুন সমস্যার ক্ষেত্রে এবং ইবাদতের সতর্কতার ক্ষেত্রে এই পরিভাষাটি নির্ভরতার প্রতীক।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, 'আল-আসাহ', 'আলাইহিল ফতোয়া' এবং 'আল-মুখতার'—এই তিনটি পরিভাষা হানাফি মাযহাবের আলোকবর্তিকা। প্রথমটি বর্ণনার বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে, দ্বিতীয়টি ফতোয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায় এবং তৃতীয়টি ফকিহদের পছন্দ বা নির্বাচন প্রকাশ করে। মুফতি ফতোয়া লেখার সময় এই শব্দগুলো দেখেই বুঝতে পারেন কোন মতটির ওপর নির্ভর করা নিরাপদ।

প্রশ্ন-৪৫: উসূলবিদদের নিকট 'মফহুম মুখালাফ'-এর অর্থ ও শর্তাবলী আলোচনা কর। হানাফীগণ কি এটিকে দলীল হিসেবে বিবেচনা করেন?

ناقش مفهوم "مفهوم المخالفة" عند الأصوليين، وهل يعتد به الحنفية (كدليل؟)

ভূমিকা (مقدمة): উসুলুল ফিকহের একটি অত্যন্ত জটিল ও বিতর্কিত বিষয় হলো 'মফহুম মুখালাফ' (বিপরীত অর্থ গ্রহণ)। কুরআন ও সুন্নাহর টেক্সট বা নস থেকে বিধান বের করার ক্ষেত্রে শাফেয়ী ও হানাফি মাযহাবের পদ্ধতির ভিন্নতা এই বিষয়টিতে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ফতোয়া প্রদানে দলীল চয়নের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিসীম।

'মফহুম মুখালাফ'-এর পরিচয় (تعريف مفهوم المخالفة): ১. আভিধানিক অর্থ: 'মফহুম' অর্থ যা বোঝা যায়, আর 'মুখালাফ' অর্থ বিপরীত। **২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"কোনো বাক্যে বর্ণিত হুকুমের সাথে যদি কোনো শর্ত, গুণ বা সংখ্যা যুক্ত থাকে, তবে সেই শর্ত বা গুণ না পাওয়া গেলে হুকুমটি তার বিপরীত হবে বলে সাব্যস্ত করাকে 'মফহুম মুখালাফ' বা 'দলিলুল খিতাব' বলে।" **উদাহরণ:** রাসূল (সা.) বলেছেন, *"চরে খাওয়া বকরির ওপর যাকাত ফরজ।"* এখানে 'চরে খাওয়া' (সায়েমা) শর্ত যুক্ত। মফহুম মুখালাফ অনুযায়ী এর অর্থ দাঁড়ায়— *যে বকরি চরে খায় না (ঘরে পালিত), তার ওপর যাকাত নেই।*

মফহুম মুখালাফের প্রকারভেদ: উসূলবিদগণ একে ৫ ভাগে ভাগ করেছেন: **১. মফহুমে সিফাত:** গুণের বিপরীত অর্থ (যেমন— চরে খাওয়া বকরি)। **২. মফহুমে শর্ত:** শর্তের বিপরীত (যেমন— যদি তওবা করে, তবে মাফ পাবে)। **৩. মফহুমে গায়াত:** সীমার বিপরীত (যেমন— রাত পর্যন্ত রোজা পূর্ণ কর)। **৪. মফহুমে আদদ:** সংখ্যার বিপরীত (যেমন— আশিটি বেত্রাঘাত কর)। **৫. মফহুমে লাক্বাব:** নামের বিপরীত (যা প্রায় সকল মাযহাবেই অগ্রহণযোগ্য)।

হানাফীগণ কি একে দলীল হিসেবে বিবেচনা করেন? (موقف الحنفية): না, হানাফি উসূলবিদগণ শরীয়তের নস বা টেক্সটের (কুরআন ও সুন্নাহ) ক্ষেত্রে **'মফহুম মুখালাফ'-কে স্বতন্ত্র শরয়ী দলীল হিসেবে স্বীকার করেন না**। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) একে গ্রহণ করেন, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একে প্রত্যাখ্যান করেন।

হানাফীদের যুক্তি (أدلة الحنفية): ১. উল্লেখ করা মানেই সীমাবদ্ধ করা নয়: হানাফিদের মতে, কোনো গুণ বা শর্ত উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে, এর বাইরে হুকুমটি প্রযোজ্য নয়। বরং গুণটি উল্লেখ করা হতে পারে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য, অথবা তৎকালীন সময়ে ওই অবস্থাটিই প্রচলিত ছিল বলে।

- **উদাহরণ:** আল্লাহ বলেন, *"সুদকে বহুগুণে ভক্ষণ করো না।"* (আলে ইমরান: ১৩০) এখানে 'বহুগুণ' শব্দটি মফহুম মুখালাফ হিসেবে ধরলে কম সুদে খাওয়া জায়েজ হওয়ার কথা। কিন্তু হানাফি ও সকল উলামাদের

মতে, কম সুদও হারাম। এখানে 'বহুগুণ' বলা হয়েছে তৎকালীন আরবের প্রথার নিন্দা জানানোর জন্য, জায়েজ করার জন্য নয়।

২. **নিরবতা মানে বাতিল নয়:** যে বিষয়ে আল্লাহ চুপ থেকেছেন (মাসকুত আনহু), তার হুকুম মফহুম দিয়ে বাতিল করা যায় না। তার জন্য অন্য দলিল (কিয়াস বা ইজমা) লাগবে।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, হানাফি মাযহাবে শরয়ী বিধান প্রণয়নে 'মফহুম মুখালাফ' গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফিগণ মনে করেন, শব্দের উচ্চারিত অর্থ (মানতুক) এবং ইঙ্গিতবাহী অর্থ (দালালাতুন নস) যথেষ্ট শক্তিশালী। মফহুম মুখালাফ অনেক সময় কুরআনের অন্য আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। তবে মানুষের কথাবার্তা ও চুক্তির ক্ষেত্রে হানাফিগণ একে শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৪৬: "মফহুমুল মুখালাফা সাধারণ মানুষের বোঝার ক্ষেত্রে ধর্তব্য, তবে শরীয়তের বক্তব্যসমূহে ধর্তব্য নয়" - এ মূলনীতিটি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়? (كيف يتم تطبيق قاعدة "مفهوم المخالف معتبر في مفاهيم الناس، لا في خطابات الشارع"؟)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি মাযহাবের একটি সূক্ষ্ম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ মূলনীতি হলো— "মফহুম মুখালাফ সাধারণ মানুষের পরিভাষায় (উরফ) ধর্তব্য, কিন্তু আল্লাহর কালামে (নস) ধর্তব্য নয়।" অনেক সময় মনে হয় হানাফিগণ স্ববিরোধী— কোথাও মফহুম মুখালাফ মানছেন, আবার কোথাও মানছেন না। মূলত এই মূলনীতিটি সেই বিভ্রান্তি দূর করে এবং ফতোয়ার সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করে।

মূলনীতিটির ব্যাখ্যা (شرح القاعدة): এই কায়দাটি দুটি অংশে বিভক্ত: ১. **শরীয়তের বক্তব্য (খিতাবুস শারি'):** কুরআন ও হাদিসের ক্ষেত্রে মফহুম মুখালাফ বা বিপরীত অর্থ গ্রহণ করা হানাফি মতে **বাতিল**। ২. **মানুষের বক্তব্য (খিতাবুন নাস):** মানুষের পারস্পরিক চুক্তি, কসম, অসিয়ত বা আদালতের রায়ের ক্ষেত্রে মফহুম মুখালাফ **গ্রহণযোগ্য**।

প্রয়োগ পদ্ধতি ও উদাহরণ (التطبيق والأمثلة):

১. শরীয়তের বক্তব্যে প্রয়োগ (প্রত্যাখ্যান): আল্লাহর কালাম অসীম এবং হেকমতপূর্ণ। সেখানে কোনো শর্ত উল্লেখ করার মানে এই নয় যে, তিনি অন্যটিকে নিষেধ করেছেন।

- **উদাহরণ:** হাদিসে এসেছে, *"ধনী ব্যক্তির ঋণ আদায়ে টালবাহানা করা জুলুম।"*
    - **মফহুম মুখালাফ:** দরিদ্র ব্যক্তির টালবাহানা জুলুম নয়?
    - **হানাফি প্রয়োগ:** হানাফিগণ এখানে মফহুম মুখালাফ নেন না। তাঁরা বলেন, ধনী বা দরিদ্র—সবার জন্যই ঋণ আদায়ে গড়িমসি করা অন্যায়। এখানে 'ধনী' শব্দটি এসেছে কারণ সাধারণত ধনীরাই ক্ষমতা দেখিয়ে টালবাহানা করে। তাই শরীয়তের ক্ষেত্রে বিপরীত অর্থ নিয়ে দরিদ্রের জন্য টালবাহানা জায়েজ বলা ভুল।

২. মানুষের বক্তব্যে প্রয়োগ (গ্রহণ): সাধারণ মানুষের কথাবার্তায় যখন কোনো শর্ত যুক্ত করা হয়, তখন তারা সাধারণত ওই শর্তের বাইরে হুকুমটি প্রয়োগ করতে চায় না। তাই এখানে বিপরীত অর্থ গ্রহণ করা হয়।

- **উদাহরণ (অসিয়ত):** এক ব্যক্তি বলল, *"আমার এই জমিটি আমার দরিদ্র ছেলেদের জন্য ওয়াকফ করলাম।"*
    - **হানাফি প্রয়োগ:** এখানে 'দরিদ্র' শব্দটি শর্ত। মফহুম মুখালাফ অনুযায়ী, তার 'ধনী' ছেলেরা এই জমির সুবিধা পাবে না। হানাফি বিচারক ও মুফতি এখানে মফহুম মুখালাফ প্রয়োগ করে ধনী ছেলেদের অধিকার বাতিল করবেন। কারণ বক্তা এখানে 'দরিদ্র' বলে ধনীদের আলাদা করতে চেয়েছেন।
- **উদাহরণ (কসম):** কেউ কসম করল, *"আমি আজ এই ঘরে প্রবেশ করব না।"*
    - **হানাফি প্রয়োগ:** এর বিপরীত অর্থ হলো, সে অন্য ঘরে বা আগামীকাল প্রবেশ করলে কসম ভঙ্গ হবে না। এখানে মানুষের কথার সীমাবদ্ধতা (Taqyeed) ধর্তব্য।

কেন এই পার্থক্য? হানাফি ফকিহদের মতে, মানুষ যখন কথা বলে, তখন তাদের উদ্দেশ্য থাকে নির্দিষ্ট বিষয়কে খাস করা। কিন্তু শরীয়তের প্রণেতা (আল্লাহ ও রাসূল সা.) অনেক সময় ভয় প্রদর্শন, উৎসাহ প্রদান বা বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্য শর্ত যুক্ত করেন, হুকুম সীমাবদ্ধ করার জন্য নয়। তাই আল্লাহর কালামে মফহুম মুখালাফ নিলে অনেক সময় বিধানের বিকৃতি ঘটে।

উপসংহার (خاتمة): এই মূলনীতিটি হানাফি ফিকহের গভীর প্রজ্ঞার পরিচায়ক। এর মাধ্যমে মুফতি একদিকে যেমন আল্লাহর বিধানকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করেন, অন্যদিকে মানুষের চুক্তি ও শর্তগুলোকেও যথাযথ মূল্যায়ন করেন। ফতোয়া প্রদানের সময় মুফতিকে অবশ্যই দেখতে হবে—বাক্যটি কি কোনো মানুষের লেখা দলিল, নাকি কুরআনের আয়াত। সেই অনুযায়ী তিনি মফহুম মুখালাফ প্রয়োগ করবেন বা বর্জন করবেন।

প্রশ্ন-৪৭: (প্রথা ও রীতির স্বীকৃতি) এ মূলনীতিটি কী? উরূফ অনুযায়ী আমল করার শর্তাবলি কী কী?

(ما هي "قاعدة اعتبار العرف والعادة"؟ وما هي شروط العمل بالعرف؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি ফিকহশাস্ত্রে ‘উরফ’ (সামাজিক প্রথা) ও ‘আদাত’ (অভ্যাস) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বহু সমস্যা এবং লেনদেনের সমাধান শরিয়তের স্পষ্ট নস (কুরআন-সুন্নাহ) বা কিয়াসের মাধ্যমে পাওয়া না গেলে, মুফতিগণ ‘উরফ’-এর শরণাপন্ন হন। হানাফি মাযহাবে উরফের গুরুত্ব অপরিসীম। ফিকহী মূলনীতি হলো— **"আল-আদাতু মুহাক্কামাহ"** (العادة محكمة) অর্থাৎ "প্রথা বা রীতিনীতি বিচারকের ভূমিকা পালন করে।"

‘উরফ ও আদাত’-এর স্বীকৃতি বা মূলনীতি (قاعدة اعتبار العرف): ১. সংজ্ঞা:

- **আভিধানিক অর্থ:** ‘উরফ’ অর্থ পরিচিত বা জানা বিষয়। আর ‘আদাত’ অর্থ যা বারবার ঘটে বা অভ্যাসে পরিণত হয়।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** উসুলবিদদের মতে, "মানুষের স্বভাব-চরিত্রে যা স্থির হয়ে গেছে এবং বিবেকের কাছে যা গ্রহণযোগ্য হিসেবে সমাজে প্রচলিত হয়েছে, তাকে উরূফ বা আদাত বলে।" **২. মূলনীতি:** শরিয়তের দৃষ্টিতে, যে সকল বিষয়ে শরিয়তের কোনো স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা (Nass) নেই, সে

সকল বিষয়ে সমাজের প্রচলিত প্রথাকে শরিয়ত দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) বলেন, "উরফ অনুযায়ী সাব্যস্ত বিষয় শরিয়তের নস দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ের মতোই।"

উরূফ অনুযায়ী আমল করার শর্তাবলি (شروط العمل بالعرف): যেকোনো প্রথা বা কুসংস্কারকে উরূফ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে উরূফকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ফকিহগণ চারটি মৌলিক শর্ত আরোপ করেছেন:

১. প্রথাটি ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্ন হওয়া (أن يكون العرف مطردا أو غالبا): প্রথাটি সমাজের সর্বস্তরের বা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে প্রচলিত থাকতে হবে। যদি কোনো প্রথা মাঝে মাঝে পালন করা হয় এবং মাঝে মাঝে ছাড়া হয়, তবে তা উরূফ হিসেবে গণ্য হবে না। এটি 'উরফে আম' (ব্যাপক প্রথা) হতে হবে, অথবা নির্দিষ্ট এলাকার জন্য 'উরফে খাস' হতে হবে যা ওই এলাকার সবার মাঝে প্রচলিত।

২. শরিয়তের স্পষ্ট নস-এর বিরোধী না হওয়া (ألا يخالف نصا شرعيا): এটি উরূফ গ্রহণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। প্রথাটি কুরআন ও সুন্নাহর কোনো অকাট্য দলিলের (Nass) বিরোধী হতে পারবে না।

- **উদাহরণ:** কোনো সমাজে যদি সুদের প্রচলন বা মদ পানের প্রথা থাকে, তবে তা 'ফাসেদ উরূফ' (বাতিল প্রথা)। এর ওপর ভিত্তি করে সুদ বা মদকে হালাল ফতোয়া দেওয়া যাবে না। উরূফ কেবল মুবাহ (বৈধ) বা অস্পষ্ট বিষয়ে কার্যকর হয়।

৩. প্রথাটি ঘটনার সময়ে বিদ্যমান থাকা (أن يكون العرف قائما عند التصرف): যে ঘটনার ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে, সেই ঘটনা ঘটার সময়ে ওই প্রথাটি সমাজে চালু থাকতে হবে। পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট কোনো নতুন প্রথা দিয়ে পূর্ববর্তী ঘটনার হুকুম দেওয়া যাবে না।

৪. প্রথার বিপরীত কোনো স্পষ্ট শর্ত না থাকা (ألا يعارضه تصريح بخلافه): চুক্তি বা লেনদেনের সময় যদি পক্ষগণ প্রথার বিপরীত কোনো শর্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে, তবে সেখানে প্রথা অকার্যকর হয়ে যাবে এবং তাদের শর্তই প্রাধান্য পাবে।

- **উদাহরণ:** প্রথা হলো বিয়ের খরচ কনের বাবা বহন করে না। কিন্তু যদি বিয়ের সময় শর্ত করা হয় যে কনের বাবাই খরচ বহন করবেন, তবে এখানে প্রথা বাতিল হয়ে শর্ত কার্যকর হবে।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, 'উরফ' হলো ফিকহী বিধানের অন্যতম প্রাণশক্তি। এটি ইসলামি শরিয়তকে গতিশীল ও যুগোপযোগী রাখে। মুফতি যখন ফতোয়া দেবেন, তখন তাঁকে অবশ্যই সমাজের প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে, তবে তা শরিয়তের সীমানার ভেতরে থেকেই হতে হবে।

প্রশ্ন-৪৮: প্রথা পরিবর্তনের কারণে ফিকহী বিধান পরিবর্তিত হয়েছে এমন তিনটি উদাহরণ উল্লেখ কর।

(اذكر ثلاثة من الأمثلة التي تغير فيها الحكم الفقهي بسبب تغير العرف.)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো— **"তাগায়্যুরুল আহকাম বি তাগায়্যুরিল আযমান"** (تغير الأحكام بتغير الأزمان) অর্থাৎ "যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে (প্রথাভিত্তিক) বিধানের পরিবর্তন ঘটে।" ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যুগের প্রথা এবং পরবর্তী যুগের প্রথার মধ্যে পার্থক্য দেখা দেওয়ায় মাযহাবের পরবর্তী ফকিহগণ (মুতাআখখিরিন) অনেক মাসআলায় পূর্ববর্তী ফতোয়া পরিবর্তন করেছেন। এটি মাযহাব ত্যাগ নয়, বরং উরফের সঠিক প্রয়োগ।

প্রথা পরিবর্তনের কারণে বিধান পরিবর্তনের তিনটি উদাহরণ:

১. কুরআন ও দ্বীন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ (أخذ الأجرة على تعليم القرآن):

- **পূর্ববর্তী বিধান:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যুগে দ্বীনী শিক্ষার জন্য বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে ভাতা দেওয়া হতো এবং মানুষের মাঝে দ্বীনী জজবা প্রবল ছিল। তাই তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, কুরআন শিক্ষা, আজান ও ইকামতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া নাজায়েজ। কারণ এগুলো ইবাদত।
- **পরিবর্তিত বিধান:** পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রীয় ভাতা বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে দ্বীনী আগ্রহ কমে যায়। এ অবস্থায় ফকিহগণ দেখলেন, যদি

পারিশ্রমিক নেওয়া নাজায়েজ রাখা হয়, তবে হাফেজ ও আলেমগণ জীবিকার সন্ধানে অন্য পেশায় চলে যাবেন এবং কুরআন শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই 'জরুরত' ও যুগের পরিবর্তনের কারণে পরবর্তী হানাফি ফকিহগণ (মুতাআখখিরিন) ফতোয়া দিয়েছেন যে, কুরআন ও দ্বীনী শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া **জায়েজ এবং হালাল**। বর্তমানে এর ওপরই ফতোয়া (আলাইহিল ফতোয়া)।

২. ইস্তিসনা বা অর্ডারি পণ্য তৈরি (عقد الاستصناع):

- **মূলনীতিগত বিধান:** কিয়াসের দাবি অনুযায়ী, ইস্তিসনা (পণ্যের অস্তিত্বহীন অবস্থায় অর্ডার দেওয়া) নাজায়েজ হওয়ার কথা। কারণ রাসূল (সা.) বলেছেন, "যা তোমার কাছে নেই, তা বিক্রি করো না।"

- **পরিবর্তিত বিধান:** কিন্তু মানুষের ব্যাপক প্রয়োজন এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথার (উরফে আম) কারণে হানাফি মাযহাবে ইস্তিসনাকে **জায়েজ** বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী লোকেরা কামার, দর্জি বা জুতা প্রস্তুতকারককে অর্ডার দিতেন। এই উরফের ওপর ভিত্তি করেই কিয়াসকে বর্জন করে ইস্তিসনার বৈধতার ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

৩. বিচারকার্য ও সাক্ষী সংক্রান্ত বিধান (القضاء والشهادة):

- **পূর্ববর্তী বিধান:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যুগে অধিকাংশ মানুষ সত্যবাদী ছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, বাহ্যিকভাবে কোনো মুসলিমকে ভালো মনে হলেই তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে, গোপনে তার চরিত্র তদন্ত করার প্রয়োজন নেই (ইক্তিফা বি যাহিরিল আদালাহ)।

- **পরিবর্তিত বিধান:** পরবর্তী যুগে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) দেখলেন যে, মানুষের মধ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। তাই তাঁরা ফতোয়া পরিবর্তন করে বললেন, এখন আর বাহ্যিক অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা যাবে না, বরং সাক্ষীর চরিত্র সম্পর্কে গোপনে তদন্ত (তাযকিয়া) করা কাজির জন্য ওয়াজিব। এটি যুগের নৈতিক পরিবর্তনের ফল।

উপসংহার (خاتمة): উপর্যুক্ত উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, ফিকহ কোনো স্থবির বিষয় নয়। যখন কোনো বিধান সরাসরি নস (কুরআন-সুন্নাহ) ভিত্তিক না হয়ে তৎকালীন প্রথার ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়, তখন প্রথা বা পরিস্থিতি বদলে

গেলে সেই ফতোয়াও বদলে যায়। এটি ইসলামি আইনের নমনীয়তা ও ব্যাপকতার পরিচায়ক।

প্রশ্ন-৪৯: 'আদাবু কিতাবাতিল ফতোয়া' (ফতোয়া লেখার শিষ্টাচার) কী? কীভাবে ফতোয়ার বিন্যাস স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হবে?
(ما هي "آداب كتابة الفتوى"؟ وكيف تكون صياغة الفتوى واضحة ومختصرة؟)

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া প্রদান কেবল সঠিক মাসআলা বের করা নয়, বরং তা সুন্দর, মার্জিত ও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করাও মুফতির দায়িত্ব। ফতোয়া লিখন পদ্ধতি বা 'আদাবু কিতাবাতিল ফতোয়া' উসুলুল ইফতা শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি অগোছালো বা দুর্বোধ্য ফতোয়া প্রশ্নকারীর বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। তাই মুফতিকে ফতোয়া লেখার সময় কিছু নির্দিষ্ট শিষ্টাচার ও বিন্যাস মেনে চলতে হয়।

'আদাবু কিতাবাতিল ফতোয়া'-এর পরিচয়: মুফতি ফতোয়া লেখার সময় কাগজের ব্যবহার, কলমের কালি, লেখার ভাষা, শব্দচয়ন, এবং উত্তর সাজানোর যে নিয়মাবলি অনুসরণ করেন, তাকে 'আদাবু কিতাবাতিল ফতোয়া' বা ফতোয়া লেখার শিষ্টাচার বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর হুকুমকে যথাযথ সম্মানের সাথে এবং নির্ভুলভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ফতোয়া লেখার বিন্যাস পদ্ধতি: ফতোয়াকে স্পষ্ট (ওয়াজিহ) ও সংক্ষিপ্ত (মুখতাসার) করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা জরুরি:

১. বিসমিল্লাহ ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু করা (البسملة والدعاء): উত্তরের শুরুতে কিছুটা ফাঁকা রেখে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লেখা এবং আল্লাহর সাহায্য চেয়ে ছোট কোনো দোয়া লেখা (যেমন— 'আল্লাহুম্মা হিদায়াতাল হাক্কি ওয়াস সওয়াব') মুস্তাহাব। এটি বরকত এবং সঠিক পথের দিশা দেয়।

২. উত্তরের ভাষা ও স্পষ্টতা (وضوح العبارة):

- **স্পষ্ট জবাব:** প্রশ্নের উত্তরটি সরাসরি এবং স্পষ্ট ভাষায় হতে হবে। যেমন— "এটি জায়েজ", "এটি হারাম", অথবা "এক্ষেত্রে হুকুম হলো..."। উত্তরের শুরুতে কোনো ভূমিকা বা অপ্রয়োজনীয় কথা না লিখে

মূল হুকুমটি আগে লেখা উচিত, যাতে প্রশ্নকারী সহজেই তার উত্তর পেয়ে যায়।

- **পরিভাষা বর্জন:** সাধারণ মানুষের জন্য ফতোয়া লেখার সময় কঠিন ফিকহী পরিভাষা বর্জন করে সহজ ও বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করতে হবে।

- **হাতের লেখা:** হাতের লেখা স্পষ্ট ও সুন্দর হতে হবে, যাতে কোনো শব্দ ভুল পড়ার অবকাশ না থাকে। কাটাকাটি বা ঘষামাজা করা ফতোয়ার নির্ভরযোগ্যতা কমিয়ে দেয়।

৩. সংক্ষিপ্ততা ও দলিল উল্লেখ (الإيجاز وذكر الدليل):

- **অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘায়ন বর্জন:** মুফতিকে 'জামে ও মানে' (সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ) ভাষায় উত্তর দিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বা তাত্ত্বিক বিতর্ক ফতোয়ার কাগজে লেখা অনুচিত।

- **দলিল প্রদান:** হুকুমের পর সংক্ষেপে কুরআন, হাদিস বা নির্ভরযোগ্য ফিকহী কিতাবের উদ্ধৃতি (ইবারতসহ বা ছাড়া) উল্লেখ করা উচিত। এতে ফতোয়ার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে এবং প্রশ্নকারীর মনে প্রশান্তি আসে।

৪. উত্তরের বিন্যাস ও সমাপ্তি (الترتيب والختم):

- উত্তরের শেষে 'ওয়াল্লাহু আলাম' (আল্লাহই ভালো জানেন) বা অনুরূপ শব্দ লেখা।

- মুফতির স্পষ্ট নাম, স্বাক্ষর এবং সিলমোহর ব্যবহার করা, যাতে ফতোয়ার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয়।

- তারিখ উল্লেখ করা।

উদাহরণস্বরূপ বিন্যাস:

প্রশ্ন: ... (প্রশ্নকারীর প্রশ্ন) ... **উত্তর:** বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় ... (সরাসরি হুকুম)। কারণ ... (সংক্ষিপ্ত কারণ)। **দলিল: ১.** হেদায়া, খণ্ড..., পৃষ্ঠা...; ২. ফতোয়ায়ে শামী, খণ্ড...। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। (স্বাক্ষর ও সিল)

উপসংহার (خاتمة): একজন দক্ষ মুফতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ফতোয়া লেখার বিন্যাসে। ফতোয়া হতে হবে এমন, যা পড়লেই প্রশ্নকারীর মনের সংশয় দূর হয়ে যায়। অস্পষ্টতা, দীর্ঘসূত্রিতা এবং দুর্বোধ্যতা পরিহার করে সংক্ষিপ্ত ও দালিলিক উত্তর দেওয়াই হলো 'আদাবু কিতাবাতিল ফতোয়া'-এর মূল কথা।

প্রশ্ন-৫০: ফতোয়া লেখার সময় মুফতীর জন্য বর্জনীয় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ কর।

(اذكر ثلاثة من أهم الأمور التي يجب على المفتي تجنبه عند كتابة الفتوى.)

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া প্রদান বা 'ইফতা' হলো একটি মহান দায়িত্ব, যা মূলত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান স্বাক্ষর করার শামিল। ফতোয়া লেখার ক্ষেত্রে মুফতিকে অত্যন্ত সতর্কতা ও আদব রক্ষা করে চলতে হয়। 'আদাবু কিতাবাতিল ফতোয়া' বা ফতোয়া লেখার শিষ্টাচারের অন্যতম দিক হলো কিছু নির্দিষ্ট বিষয় বর্জন করা, যা ফতোয়ার মান ক্ষুণ্ন করে বা প্রশ্নকারীর জন্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) এবং অন্যান্য ফকিহগণ এ বিষয়ে মুফতিদের সতর্ক করেছেন।

ফতোয়া লেখার সময় বর্জনীয় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

১. অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্য ভাষা বর্জন (تجنب الغموض والإبهام): মুফতির প্রধান দায়িত্ব হলো সত্য প্রকাশ করা এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সমাধান দেওয়া। ফতোয়া লেখার সময় মুফতিকে এমন ভাষা বা শব্দচয়ন বর্জন করতে হবে, যা অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক।

- **সমস্যা:** মুফতি যদি এমন কঠিন ফিকহী পরিভাষা ব্যবহার করেন যা সাধারণ মানুষ বোঝে না, অথবা এমন পেঁচানো বাক্য লেখেন যার একাধিক অর্থ হতে পারে, তবে প্রশ্নকারী সঠিক আমল করতে পারবে না। এতে ফতোয়ার মূল উদ্দেশ্য 'হেদায়াত' বা পথপ্রদর্শন ব্যাহত হয়।
- **করণীয়:** মুফতির হাতের লেখা স্পষ্ট হতে হবে (তাজবীদুল খত)। কাটাকাটি বা ঘষামাজা করা যাবে না। উত্তরের ভাষা হতে হবে 'জামে ও মানে' অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট। উত্তরটি 'হ্যাঁ' বা 'না' বোধক হলে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, এরপর সংক্ষিপ্ত দলিল দিতে হবে।

২. অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘায়ন ও অতিরিক্ত বিবরণ বর্জন (تجنب التطويل الممل والاستطراد): ফতোয়া কোনো ওয়াজের মজলিস বা গবেষণাপত্র নয়। প্রশ্নকারী সাধারণত একটি নির্দিষ্ট হুকুম জানতে চায়। তাই মুফতিকে অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ আলোচনা বর্জন করতে হবে।

- **সমস্যা:** ফতোয়ায় যদি মুফতি মূল উত্তরের বাইরে গিয়ে অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, অথবা মাযহাবের ভেতরের খুটিনাটি মতভেদ উল্লেখ করতে থাকেন যা প্রশ্নকারীর জন্য জরুরি নয়, তবে তা প্রশ্নকারীকে বিরক্ত ও বিভ্রান্ত করতে পারে। একে 'তাতবীল' বা 'ইস্তিতরাদ' বলা হয়।

- **করণীয়:** মুফতি কেবল প্রশ্নের بقدر (পরিমাণমতো) উত্তর দেবেন। প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট জরুরি শর্ত বা সতর্কবাণী ছাড়া অতিরিক্ত কথা লিখবেন না। তবে যদি প্রশ্নটি এমন হয় যে বিস্তারিত বিবরণ ছাড়া উত্তর অসম্পূর্ণ থেকে যায় (তাফসিল তলব), তবে সেক্ষেত্রে বিস্তারিত লেখা দূষণীয় নয়।

৩. দুর্বল ও শায মতের ওপর ফতোয়া লেখা বর্জন (تجنب الإفتاء بالأقوال الضعيفة والشاذة): এটি ফতোয়া লেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক দিক। মুফতিকে অবশ্যই মাযহাবের দুর্বল (মাজরুহ) এবং বিচ্ছিন্ন (শায) মতগুলো বর্জন করতে হবে।

- **সমস্যা:** কোনো মুফতি যদি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য বা 'মুফতা বিহি' (ফতোয়াযোগ্য) মত বাদ দিয়ে নিজের খেয়ালখুশি মতো দুর্বল কোনো রিওয়ায়াত বা মতের ওপর ফতোয়া লিখে দেন, তবে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম এবং খিয়ানত হিসেবে গণ্য হবে।

- **করণীয়:** ফতোয়া লেখার সময় মুফতিকে নিশ্চিত হতে হবে যে, তিনি যে হুকুমটি লিখছেন তা হানাফি মাযহাবের 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা পরবর্তী ফকিহদের (আসহাবুত তারজিহ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সঠিক। দলিলের দোহাই দিয়ে মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত মতের বিপরীতে দুর্বল মত লেখা ফিতনা সৃষ্টির শামিল।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, ফতোয়া লিখন একটি আমানত। মুফতিকে এই আমানত রক্ষার জন্য লেখার অস্পষ্টতা, অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘসূত্রিতা এবং দুর্বল

মতের অনুসরণ কঠোরভাবে পরিহার করতে হবে। তাঁর লেখা ফতোয়া হতে হবে সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট এবং মাযহাবের নির্ভরযোগ্য দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যাতে উম্মাহ সঠিক পথের দিশা পায়।

মুফতীর আদবসমূহ

প্রশ্ন-৫১: নতুন সৃষ্ট মাসায়েল (নাওয়াবিল) যেগুলো ফকীহগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি, সেগুলোতে ফতোয়া দেওয়ার বিধান কী?

ما حكم الإفتاء في القضايا المستجدة (النوازل) التي لم ينص عليها (الفقهاء صراحة؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলাম একটি শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জীবনে যত নতুন সমস্যা বা 'নাওয়াজিল' (Nawazil) আসবে, ইসলামে তার সমাধান রয়েছে। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে এমন অনেক বিষয় সামনে আসে (যেমন— ডিজিটাল কারেন্সি, টেস্ট টিউব বেবি, আধুনিক ব্যবসায়িক চুক্তি), যেগুলো সম্পর্কে প্রাচীন ফকিহগণের কিতাবে সরাসরি কোনো স্পষ্ট উক্তি (Nass) পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় মুফতি কীভাবে ফতোয়া দেবেন, তার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা উসূলুল ইফতা শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

'নাওয়াজিল' বা নতুন মাসায়েলে ফতোয়া দেওয়ার বিধান:

১. মুজতাহিদের জন্য ইজতেহাদ: যদি মুফতি স্বয়ং 'মুজতাহিদে মুতলাক' (স্বাধীন গবেষক) হন, তবে তিনি সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইজতেহাদ করে নতুন সমস্যার সমাধান বের করবেন। তবে বর্তমান যুগে এমন মুজতাহিদ পাওয়া দুষ্কর।

২. মুকাল্লিদ মুফতির পদ্ধতি (তাখরীজ): বর্তমান যুগের মুফতিরা সাধারণত মুকাল্লিদ। তাঁরা সরাসরি ইজতেহাদ করতে পারেন না। তবে তাঁরা 'আসহাবুত তাখরীজ'-এর মূলনীতি অনুসরণ করে সমাধান দিতে পারেন। পদ্ধতিগুলো হলো:

- **নজির বা সমজাতীয় মাসআলা তালাশ করা (Search for Precedents):** মুফতি দেখবেন এই নতুন সমস্যাটির সাথে হানাফি মাযহাবের পূর্ববর্তী কোনো মাসআলার মিল (Similitude) আছে কি না। যদি থাকে, তবে 'কিয়াস' বা এনালজির মাধ্যমে তিনি ফতোয়া দেবেন। একে 'তাখরীজ' বলা হয়।
    - *উদাহরণ:* বিটকয়েন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির হুকুম দিতে গিয়ে মুফতি দেখবেন ফিকহের কিতাবে 'মাল' (সম্পদ) ও 'ছামান' (মুদ্রা)-এর সংজ্ঞার সাথে এটি মিলে কি না।

- **মাযহাবের উসুল বা মূলনীতি প্রয়োগ:** যদি হুবহু কোনো নজির না পাওয়া যায়, তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত 'উসুল' বা মূলনীতিগুলোর (Principles) আলোকে সমাধান বের করতে হবে। যেমন— 'আদ-দারারু ইউযাল' (ক্ষতি দূর করতে হবে), 'আল-আদাতু মুহাক্কামাহ' (প্রথাই বিচারক)।

৩. যৌথ ইজতেহাদ বা ফিকহী বোর্ড (Collective Ijtihad): বর্তমান যুগের নাওয়াজিলগুলো অত্যন্ত জটিল। একজন একক মুফতির পক্ষে এর গভীরতা বোঝা কঠিন। তাই নির্ভরযোগ্য বিধান হলো— বড় বড় ফকিহদের সমন্বয়ে গঠিত 'ফিকহী বোর্ড' বা সেমিনারের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে ফতোয়া দেওয়া।

- **পদ্ধতি:** প্রথমে বিষয়টির বাস্তব রূপ (Taswir al-Mas'ala) অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের (যেমন— ডাক্তার, অর্থনীতিবিদ) কাছ থেকে জেনে নেওয়া। এরপর ফকিহগণ সম্মিলিতভাবে আলোচনা করে শরীয়তের আলোকে সিদ্ধান্ত দেবেন। একা একা ফতোয়া দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ।

৪. জরুরত ও উরফের বিবেচনা: নতুন মাসআলার ক্ষেত্রে মুফতিকে মানুষের 'জরুরত' (অপরিহার্যতা) এবং 'উরফ' (সামাজিক প্রথা)-এর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি কোনো নতুন পদ্ধতি মানুষের জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায় এবং তাতে শরীয়তের কোনো অকাট্য হারাম বিষয় না থাকে, তবে সহজীকরণের (Taisir) স্বার্থে তা জায়েজ বলা যেতে পারে।

সতর্কতা: যে বিষয়ে মুফতি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবেন না, সেখানে "আল্লাহই ভালো জানেন" বলে চুপ থাকা ওয়াজিব। না জেনে বা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নতুন বিষয়ে ফতোয়া দেওয়া হারাম।

উপসংহার (خاتمة): নতুন সৃষ্ট সমস্যা বা নাওয়াজিলের সমাধান দেওয়া মুফতির পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা। এক্ষেত্রে বিধান হলো— মাযহাবের উসুল ও নজিরের আলোকে 'তাখরীজ' করা এবং একক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে অভিজ্ঞ আলেমদের সাথে পরামর্শক্রমে (মাশওয়ারা) ফতোয়া প্রদান করা। এতে ভুলের সম্ভাবনা কমে এবং উম্মাহ সঠিক সমাধান পায়।

প্রশ্ন-৫২: মাযহাবের বহুত্বের সাথে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সাধনে মুফতীর ভূমিকা কী?

ما هو دور المفتي في تحقيق الوحدة بين الأمة الإسلامية مع تعدد المذاهب؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি ফিকহে মাযহাবের ভিন্নতা (Ikhtilaf) উম্মাহর জন্য রহমতস্বরূপ। কিন্তু অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির কারণে অনেক সময় এই ফিকহী মতভেদ উম্মাহর অনৈক্য ও বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একজন মুফতি হলেন সমাজের দ্বীনী নেতা। ফিকহী মাযহাবের বৈচিত্র্য বজায় রেখেও কীভাবে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য (Ittihad) ধরে রাখা যায়, সে বিষয়ে মুফতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সাধনে মুফতীর ভূমিকা:

১. মতভেদের শিষ্টাচার (আদাবুল ইখতিলাফ) শিক্ষা দেওয়া: মুফতির প্রধান দায়িত্ব হলো সাধারণ মানুষকে বোঝানো যে, ফুরুঈ (শাখা-প্রশাখা) মাসআলায় মাযহাবগুলোর মতভেদ কোনো বিরোধ নয়, বরং এটি গবেষণার ভিন্নতা। মুফতি তাঁর ফতোয়া ও আলোচনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদগণের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উদাহরণ তুলে ধরবেন। তিনি শেখাবেন যে, অন্য মাযহাবের আমলও কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক এবং তা শ্রদ্ধার যোগ্য।

২. মাযহাবী গোঁড়ামি (আত-তাআসসুব) বর্জন ও নিরুৎসাহিত করা: মুফতি নিজে হানাফি মাযহাবের অনুসারী হয়ে তার ওপর আমল করবেন এবং ফতোয়া দেবেন, কিন্তু অন্য মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষ বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করবেন না।

- **ভূমিকা:** কেউ যদি শাফেয়ী বা মালেকি মাযহাব অনুযায়ী আমল করে, তবে মুফতি তাকে "ভুল করছো" বা "বাতিল পন্থী" বলে ফতোয়া দেবেন না। বরং তিনি মানুষের মন থেকে সংকীর্ণতা দূর করবেন এবং বোঝাবেন যে, হক বা সত্য কেবল এক মাযহাবে সীমাবদ্ধ নয়। মুফতি সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান (রহ.)-এর মতে, মুফতিকে মধ্যপন্থী হতে হবে।

৩. ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়গুলোতে গুরুত্বারোপ করা: মুফতি তাঁর ফতোয়ায় ও বয়ানে উম্মাহকে বোঝাবেন যে, আমাদের আকিদা, কুরআন, রাসুল (সা.) এবং শরীয়তের মৌলিক স্তম্ভগুলো এক ও অভিন্ন। ছোটখাটো মাসআলায় (যেমন—

হাত বাঁধা, আমিন বলা) মতভেদ থাকলেও তা যেন ভ্রাতৃত্বের ফাটল না ধরায়। তিনি 'উসুল' বা মৌলিক ঐক্যের ওপর জোর দিয়ে 'ফুরু' বা শাখার মতভেদকে সহনীয় পর্যায়ে রাখবেন।

৪. আক্রমণাত্মক ফতোয়া পরিহার করা: উম্মাহর ঐক্য রক্ষায় মুফতিকে অত্যন্ত সংযত হতে হবে। সামান্য মতভেদের কারণে কাউকে 'ফাসিক', 'বিদআতি' বা 'কাফির' ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

- **ভূমিকা:** যদি কোনো বিষয় মুজতাহিদদের ইজতেহাদী বিষয় হয়, তবে সেখানে কঠোরতা করা যাবে না। মুফতি মানুষকে উদারতা ও সহনশীলতার শিক্ষা দেবেন।

৫. ফিকহুল মুকারান (তুলনামূলক ফিকহ)-এর জ্ঞান কাজে লাগানো: মুফতি যদি তুলনামূলক ফিকহ জানেন, তবে তিনি বুঝতে পারবেন যে প্রতিটি মাযহাবের পেছনেই শক্তিশালী দলিল রয়েছে। এই জ্ঞান তাকে উদার হতে সাহায্য করবে। তিনি যখন ফতোয়া দেবেন, তখন অন্য মতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই নিজের মাযহাবের রায় দেবেন, যাতে সমাজে ফিতনা সৃষ্টি না হয়।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, মুফতি হলেন উম্মাহর ঐক্যের সেতুবন্ধন। মাযহাবের ভিন্নতা একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বিষয়। মুফতির দায়িত্ব হলো এই ভিন্নতাকে বিবাদে পরিণত না হতে দেওয়া। তিনি মানুষকে শেখাবেন যে, **"আমাদের মাযহাব সঠিক তবে ভুলের সম্ভাবনা রাখে, আর অন্যের মাযহাব ভুল তবে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।"** এই উদার নীতিই উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে পারে।

প্রশ্ন-৫৩: যে ফতোয়ার ফলে সমাজে অকল্যাণ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, মুফতী তা কীভাবে সমাধান করবেন?

كيف يتعامل المفتي مع الفتوى التي يترتب عليها مفسدة أو فوضى في المجتمع؟)

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের দ্বীনী সমস্যার সমাধান দেওয়া এবং সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। ইসলামি শরিয়তের একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো 'মাসলাহাত' (জনকল্যাণ) অর্জন করা এবং 'মাফসাদা' (অকল্যাণ) দূর করা। একজন মুফতি কেবল কিতাবের ইবারত বা পাঠ দেখেই

ফতোয়া দেন না, বরং তিনি ফতোয়ার ফলাফল বা 'মআল' (Outcome)-এর দিকেও লক্ষ্য রাখেন। যদি কোনো বৈধ ফতোয়া প্রয়োগের ফলে সমাজে বড় ধরনের ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, তবে মুফতিকে হেকমতের সাথে তা সমাধান করতে হয়।

অকল্যাণকর পরিস্থিতিতে মুফতির করণীয় ও নীতিমালা:

১. মাফসা দা বা অকল্যাণ দূরীকরণ (درء المفاسد): ফিকহী মূলনীতি হলো— **"কল্যাণ অর্জনের চেয়ে অকল্যাণ দূর করা অগ্রগণ্য।"** (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)। যদি মুফতি দেখেন যে, প্রশ্নকারীকে একটি জায়েজ বা মুস্তাহাব কাজের অনুমতি দিলে সমাজে বড় ধরনের বিবাদ, রক্তপাত বা ফিতনা সৃষ্টি হবে, তবে তিনি সাময়িকভাবে সেই জায়েজ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে পারেন।

- **উদাহরণ:** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সফরে নামাজ কসর করার পক্ষে ছিলেন, কিন্তু তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর পেছনে পূর্ণ নামাজ পড়েছেন কেবল মুসলিম ঐক্যে ফাটল না ধরার জন্য।

২. ফিতনার আশঙ্কা থাকলে সত্য গোপন করা (كتمان العلم للفتنة): সাধারণত ইলম গোপন করা হারাম। কিন্তু যদি কোনো মাসআলা সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারে এবং তা শোনার পর তারা বিভ্রান্ত হয় বা ঈমানহারা হওয়ার উপক্রম হয়, তবে মুফতি সেই মাসআলাটি এড়িয়ে যেতে পারেন বা চুপ থাকতে পারেন।

- **হাদিস:** রাসূল (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন, "তোমার জাতি যদি নওমুসলিম না হতো, তবে আমি কাবা ঘর ভেঙ্গে ইব্রাহিম (আ.)-এর ভিত্তির ওপর পুনর্নির্মাণ করতাম।" এখানে রাসূল (সা.) ফিতনার আশঙ্কায় একটি উত্তম কাজ থেকেও বিরত থেকেছেন।

৩. পরিস্থিতির বাস্তবতা অনুধাবন (فقه الواقع): মুফতিকে অবশ্যই 'ফিকহুল ওয়াকি' বা পরিস্থিতির জ্ঞান রাখতে হবে। কোনো এলাকায় যদি বিশেষ কোনো বিদআত বা কুপ্রথা এমনভাবে গেড়ে বসে যে, কঠোরভাবে নিষেধ করলে মানুষ বিদ্রোহ করবে, তবে মুফতি সেখানে ধাপে ধাপে (তাদরিজ) সংশোধনের পথ বেছে নেবেন। সরাসরি এমন ফতোয়া দেবেন না যা মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

৪. হিলা বা বিকল্প পথ বাতলে দেওয়া (المخرج الشرعي): যদি কোনো হারাম কাজ থেকে বাঁচতে গিয়ে মানুষ বড় কোনো বিপদে পড়ে, তবে মুফতি শরিয়তের সীমার ভেতর থেকে 'হিলা' বা 'মাখরাজ' (বের হওয়ার পথ) খুঁজে দেবেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, যদি কেউ রাগের মাথায় স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় এবং পরে অনুতপ্ত হয় এবং সংসার ভাঙলে সন্তানদের বড় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে মুফতি হানাফি মাযহাবের ভেতরে কোনো দুর্বল মত বা অন্য কোনো শরয়ী কৌশলের মাধ্যমে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবেন (যদি সুযোগ থাকে), যাতে পরিবারটি ধ্বংস না হয়।

৫. সরকারকে বা কর্তৃপক্ষকে জানানো: যদি বিষয়টি এমন হয় যে, ফতোয়া দিলে জনগণ আইন হাতে তুলে নিতে পারে, তবে মুফতি প্রকাশ্যে ফতোয়া না দিয়ে বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের (কাজি বা সরকার) কাছে ন্যস্ত করবেন। কারণ দণ্ডবিধি কার্যকর করা বা বিচার করা মুফতির কাজ নয়।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, মুফতি কেবল বিধানের বার্তাবাহক নন, তিনি একজন হাকিম বা প্রজ্ঞাবান চিকিৎসকও বটে। যে ওষুধে রোগীর মৃত্যু হতে পারে, ডাক্তার তা দেন না। তদ্রূপ, যে ফতোয়ায় উম্মাহর ফিতনা বাড়ে, মুফতি তা সরাসরি প্রয়োগ না করে বিকল্প হেকমত অবলম্বন করেন। এটিই হলো ফতোয়া প্রদানের আদব ও শরিয়তের লক্ষ্য।

প্রশ্ন-৫৪: ফতোয়া প্রদান ও বিধি-বিধান পরিবর্তনে 'জরুরত' (অপরিহার্যতা) ও 'হাজত' (প্রয়োজন)-এর প্রভাব আলোচনা কর।

(.ناقش أثر "الضرورة" و"الحاجة" على إصدار الفتوى وتغيير الأحكام)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরিয়ত মানুষের সাধ্যের বাইরে কোনো বোঝা চাপিয়ে দেয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।" ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের অপারগতা, বাধ্যবাধকতা বা 'জরুরত' এবং সাধারণ প্রয়োজন বা 'হাজত' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হানাফি ফিকহে এই দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে অনেক কঠিন বিধানকে সহজ করা হয়েছে।

'জরুরত' ও 'হাজত'-এর সংজ্ঞা:

- **জরুরত (الضرورة):** এমন ভয়াবহ অবস্থা, যেখানে নিষিদ্ধ কাজ না করলে মানুষের জীবন, সম্পদ বা দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন— অনাহারে মৃত্যুঝুঁকি দেখা দিলে শুকরের মাংস খাওয়া।

- **হাজত (الحاجة):** এমন অবস্থা, যেখানে নিষিদ্ধ কাজ না করলে জীবন ধ্বংস হবে না, কিন্তু মানুষ চরম কষ্ট ও সংকীর্ণতার শিকার হবে।

ফতোয়া ও বিধান পরিবর্তনে এদের প্রভাব:

১. জরুরত বা বাধ্যবাধকতার প্রভাব (أثر الضرورة): ফিকহী মূলনীতি হলো— **"অপরিহার্যতা নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে দেয়।"** (الضرورات تبيح المحظورات)। মুফতি যখন দেখেন কোনো ব্যক্তি 'জরুরত'-এর স্তরে পৌঁছে গেছে, তখন তিনি হারামকে সাময়িকভাবে হালাল হওয়ার ফতোয়া দেন।

- **উদাহরণ:** মদ পান করা হারাম। কিন্তু যদি কারো গলায় খাবার আটকে যায় এবং পানি না থাকে, তবে প্রাণ বাঁচাতে এক ঢোক মদ পান করা জায়েজ।

- **শর্ত:** এই বৈধতা কেবল জীবন বাঁচানো পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। মূলনীতি হলো— **"প্রয়োজন পরিমাণ অনুসারেই বৈধতা নির্ধারিত হবে।"**

২. হাজত বা প্রয়োজনাদির প্রভাব (أثر الحاجة): ফিকহী মূলনীতি হলো— **"প্রয়োজনীয়তা (হাজত) অনেক সময় জরুরতের স্থলাভিষিক্ত হয়, চাই তা ব্যাপক হোক বা বিশেষ।"** (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)। অর্থাৎ, জীবননাশের হুমকি না থাকলেও যদি মানুষ ব্যাপক কষ্টের সম্মুখীন হয়, তবে ফতোয়া পরিবর্তন করা যায়।

- **উদাহরণ (ইস্তিসনা):** পণ্য না দেখে বা অস্তিত্বহীন পণ্যের বেচাকেনা কিয়াসের দৃষ্টিতে নাজায়েজ। কিন্তু মানুষের ব্যাপক প্রয়োজন (হাজত)-এর কারণে ফকিহগণ একে জায়েজ বলেছেন।

- **চিকিৎসা:** পরপুরুষের সামনে সতর খোলা হারাম। কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজনে (হাজত) ডাক্তারকে সতর দেখার অনুমতি দেওয়া হয়।

৩. বিধান পরিবর্তন (تغير الأحكام): যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনও বদলে যায়। পূর্ববর্তী যুগে যা 'হাজত' ছিল না, বর্তমানে তা 'জরুরত' হতে পারে। মুফতি এই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে ফতোয়া পরিবর্তন করেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে টাকা নেওয়া নাজায়েজ ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে হাফেজ ও আলেমদের জীবিকার সংকট (জরুরত) দেখা দিলে এবং দ্বীন বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হলে, মুতাআখখিরিন ফকিহগণ ফতোয়া পরিবর্তন করে বেতন নেওয়া জায়েজ করেছেন।

৪. উমুমে বালওয়া (ব্যাপক সমস্যা): যখন কোনো হারাম বা নাজায়েজ বিষয় সমাজে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তা থেকে বাঁচা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় (উমুমে বালওয়া), তখন মুফতি 'হাজত'-এর ওপর ভিত্তি করে সহজতর ফতোয়া প্রদান করেন। যেমন— রাস্তার কাদা-পানি নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা থেকে বাঁচা কঠিন হওয়ায় একে পাক ধরা হয়।

উপসংহার (خاتمة): 'জরুরত' ও 'হাজত' শরিয়তের নমনীয়তার পরিচায়ক। তবে মুফতির জন্য সতর্ক থাকা আবশ্যক যেন এই সুযোগে মানুষ শরিয়তের বিধান নিয়ে খেল-তামাশা না করে। তিনি কেবল শরয়ী শর্ত পাওয়া গেলেই কঠোরতা শিথিল করবেন, নতুবা মূল বিধানের ওপর অটল থাকবেন।

প্রশ্ন-৫৫: মুফতীর কাজের প্রেক্ষাপটে 'আল-মাসআলা আল-ফিকহিয়্যাহ' (ফিকহী মাসআলা) এবং 'আল-ওয়াকিয়া' (ঘটিত ঘটনা)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين "المسألة الفقهية" و"الواقعة" في سياق عمل المفتي؟)

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া প্রদানের প্রক্রিয়াটি দুটি ভিন্ন জগতের সমন্বয় সাধন। একটি হলো কিতাবের জগত, আরেকটি হলো বাস্তব জগত। উসূলুল ইফতা শাস্ত্রে মুফতির কাজের পরিধি বোঝার জন্য 'আল-মাসআলা আল-ফিকহিয়্যাহ' (তাত্ত্বিক মাসআলা) এবং 'আল-ওয়াকিয়া' (বাস্তব ঘটনা)-এর পার্থক্য বোঝা অপরিহার্য। এই দুটির সঠিক সংযোগ বা 'তানযিল'-এর নামই হলো ফতোয়া।

১. আল-মাসআলা আল-ফিকহিয়্যাহ (المسألة الفقهية): ক. সংজ্ঞা: এটি হলো ফিকহ বা ফতোয়ার কিতাবে বর্ণিত সাধারণ ও তাত্ত্বিক বিধান। এটি কোনো নির্দিষ্ট

ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং এটি একটি সার্বজনীন আইন (General Rule)। **খ. বৈশিষ্ট্যঃ**

- এটি শরিয়তের উৎস (কুরআন, সুন্নাহ, কিয়াস) থেকে মুজতাহিদগণ বের করে কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।
- এটি অপরিবর্তনশীল (সাধারণত)। যেমন— "সুদ খাওয়া হারাম", "নামাজে হাসলে অজু ভাঙ্গে" (হানাফি মতে)।
- এটি 'মানকুল' বা বর্ণিত জ্ঞান। মুফতি কিতাব থেকে এটি মুখস্থ করেন বা বের করেন।

২. আল-ওয়াকিয়া (الواقعة): ক. সংজ্ঞাঃ 'ওয়াকিয়া' শব্দের অর্থ ঘটনা। এটি হলো প্রশ্নকারীর জীবনে ঘটে যাওয়া সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা সমস্যা, যা নিয়ে সে মুফতির কাছে এসেছে। একে 'নাজিলা' বা 'সুয়াল'ও বলা হয়। **খ. বৈশিষ্ট্যঃ**

- এটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি, সময় ও স্থানের সাথে সম্পৃক্ত।
- এটি পরিবর্তনশীল। এক ব্যক্তির ঘটনার সাথে অন্য ব্যক্তির ঘটনার মিল নাও থাকতে পারে।
- এটি 'মাশহুদ' বা পর্যবেক্ষণলব্ধ বিষয়। মুফতিকে প্রশ্নকারীর কথা শুনে এটি বুঝতে হয়।

৩. উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও মুফতির কাজঃ

পার্থক্যের বিষয়	আল-মাসআলা আল-ফিকহিয়্যাহ (তাত্ত্বিক)	আল-ওয়াকিয়া (বাস্তব ঘটনা)
উৎস	ফিকহ ও ফতোয়ার কিতাবসমূহ।	প্রশ্নকারীর বর্ণনা বা সমাজ ব্যবস্থা।
প্রকৃতি	সার্বজনীন (Universal) হুকুম।	বিশেষ (Specific) ঘটনা।
উদাহরণ	"শুকর খাওয়া হারাম, তবে জীবন বাঁচাতে জায়েজ।"	"জায়েদ একটি দ্বীপে আটকা পড়েছে এবং শুকর ছাড়া কিছু নেই।"

মুফতির কাজ (সংযোগ স্থাপন): মুফতির আসল দক্ষতা হলো 'আল-ওয়াকিয়া' (বাস্তব ঘটনা)-কে সঠিকভাবে অনুধাবন করা (যাকে 'তাসবিরুল মাসআলা' বলে) এবং তার ওপর 'আল-মাসআলা আল-ফিকহিয়্যাহ' (কিতাবের বিধান)-কে ফিট করা বা প্রয়োগ করা (যাকে 'তানযিল' বা 'তাতবিক' বলে)।

- **ভুলের আশঙ্কা:** অনেক সময় মুফতি 'ফিকহী মাসআলা' জানেন (যেমন— তালাকের মাসআলা), কিন্তু 'ওয়াকিয়া' বুঝতে ভুল করেন (রাগের মাত্রা বা শব্দের ধরন বুঝতে পারেন না)। ফলে তিনি সঠিক মাসআলাটি ভুল ঘটনায় প্রয়োগ করে বসেন।

- **উদাহরণ:** কিতাবে আছে "চাপপ্রয়োগে (ইকরাহ) তালাক হয় না" (শাফেয়ী মতে) বা "হয়" (হানাফি মতে)। এখন জায়েদের ঘটনাটি কি আসলেই 'ইকরাহ'-এর স্তরে পড়েছে? এটি যাচাই করাই হলো 'ওয়াকিয়া' বোঝা। যদি মুফতি কেবল কিতাবের বুলি আওড়ান কিন্তু ঘটনা না বোঝেন, তবে ফতোয়া ভুল হবে।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, 'মাসআলা আল-ফিকহিয়্যাহ' হলো ডাক্তারের কাছে থাকা ওষুধের জ্ঞান, আর 'আল-ওয়াকিয়া' হলো রোগীর নির্দিষ্ট রোগ। মুফতিকে সফল হতে হলে ওষুধের জ্ঞান এবং রোগ নির্ণয়—উভয়টিতে দক্ষ হতে হবে। কিতাবের মাসআলাকে বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষাপটে সঠিক শর্তসাপেক্ষে প্রয়োগ করাই মুফতির প্রধান চ্যালেঞ্জ ও দায়িত্ব।

প্রশ্ন-৫৬: হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য উসূল (নীতি)-এর উপর বিধি-বিধান কীভাবে বের করা হয় (তাখরীজ করা হয়)?

(كيف يتم تخريج الأحكام على الأصول المعتمدة في المذهب الحنفي؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি ফিকহ একটি ক্রমবিকাশমান বিজ্ঞান। যুগের পরিবর্তনে এমন হাজারো সমস্যা সৃষ্টি হয়, যা সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ বা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর স্পষ্ট উক্তিতে (Nass) পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় হানাফি মাযহাবের পরবর্তী ফকিহগণ (আসহাবুত তাখরীজ) মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি বা 'উসূল'-এর ওপর ভিত্তি করে নতুন বিধান বের করেন। এই প্রক্রিয়াকে 'তাখরীজ' (التخريج) বলা হয়। এটি মাযহাবকে গতিশীল রাখার অন্যতম মাধ্যম।

'তাখরীজ'-এর সংজ্ঞা ও স্বরূপ:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'তাখরীজ' শব্দটি 'খারাজ' মূলধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ বের করা বা নির্গত করা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** মুজতাহিদ ইমামদের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি (উসূল) বা সাধারণ বিধিমালার (কাওয়ায়িদ) ওপর ভিত্তি করে নতুন বা শাখা মাসআলার (ফুরু) সমাধান বের করাকে তাখরীজ বলে। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.)-এর মতে, যারা এই কাজ করেন তাদের 'আসহাবুত তাখরীজ' বা 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' বলা হয় (যেমন— ইমাম কারখী, জাসসাস)।

হানাফী মাযহাবে তাখরীজ করার পদ্ধতি (Methodology of Takhrij):

একজন দক্ষ মুফতি বা মুখাররিজ (তাখরীজকারী) হানাফি মাযহাবে বিধান বের করার জন্য নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করেন:

১. নজির বা সদৃশ মাসআলা তালাশ করা (البحث عن النظير): তাখরীজের প্রথম ধাপ হলো, নতুন সমস্যাটির সাথে হুবহু মিল আছে এমন কোনো মাসআলা পূর্ববর্তী ইমামদের কিতাবে (যাহিরুর রিওয়ায়াহ) খোঁজা।

- **পদ্ধতি:** মুফতি দেখবেন নতুন সমস্যাটির 'ইল্লত' (কারণ) এবং ইমামদের বর্ণিত মাসআলার 'ইল্লত' এক কি না। যদি এক হয়, তবে তিনি 'কিয়াস' (Analogy)-এর মাধ্যমে পুরাতন বিধানটি নতুনের ওপর প্রয়োগ করবেন।
- **উদাহরণ:** আধুনিক 'ড্রাগস' বা নেশাজাতীয় ট্যাবলেটের হুকুম দিতে গিয়ে মুফতি মদের বিধানের ওপর কিয়াস করে তা হারাম বলবেন, কারণ উভয়ের ইল্লত হলো 'নেশা সৃষ্টি করা'।

২. ইমামদের উসূল বা মূলনীতির প্রয়োগ (تطبيق الأصول): যদি হুবহু কোনো নজির না পাওয়া যায়, তবে মুখাররিজ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রতিষ্ঠিত উসূল বা মূলনীতিগুলোর দিকে তাকাবেন।

- **পদ্ধতি:** ইমামের উসূল হলো— প্রথমে কুরআন, এরপর সুন্নাহ, এরপর সাহাবীদের ফতোয়া, এরপর কিয়াস এবং শেষে ইস্তিহসান। নতুন মাসআলাটি এই মানদণ্ডে ফেলে সমাধান বের করা হয়।

- **উদাহরণ:** ইমামের উসূল হলো, "খবর-এ ওয়াহিদ (একক বর্ণনা) দ্বারা কুরআনের আম বা ব্যাপক বিধানকে রহিত করা যায় না।" এই উসূলের ওপর ভিত্তি করে মুফতি নতুন মাসআলায় সিদ্ধান্ত দেবেন যে, খবরে ওয়াহিদের কারণে কুরআনের বিধান ছাড়া যাবে না, তবে সমন্বয় করা যাবে।

৩. সাধারণ ফিকহী কাওয়ায়িদ ব্যবহার (استخدام القواعد الفقهية): হানাফি মাযহাবে 'উসূলুল কারখী' বা 'উসূলুদ দাবূসী'-এর মতো কিতাবে অনেকগুলো সাধারণ নিয়ম (Maxims) রয়েছে। যেমন— "ইয়াকিন বা নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না"।

- **প্রয়োগ:** কেউ অজু করেছে কি না সন্দেহ হলে, এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে (তাখরীজ করে) বলা হবে যে, তার অজু নেই (যদি আগে নাপাক থাকে) বা আছে (যদি আগে পাক থাকে)।

৪. ইস্তিহসান বা জনকল্যাণমূলক বিবেচনা (الاستحسان): হানাফি মাযহাবের তাখরীজ পদ্ধতিতে 'ইস্তিহসান' একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এর অর্থ হলো— সূক্ষ্ম কিয়াস বা জনকল্যাণের স্বার্থে প্রকাশ্য কিয়াসকে বর্জন করা।

- **প্রয়োগ:** কোনো নতুন মাসআলায় যদি সাধারণ কিয়াস প্রয়োগ করলে মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হয়, তবে মুফতি ইস্তিহসানের উসূল ব্যবহার করে সহজতার ফতোয়া দেবেন। যেমন— ইস্তিসনা (অর্ডারি পণ্য) জায়েজ হওয়া।

৫. উরফ বা প্রথার মূল্যায়ন: তাখরীজের সময় মুফতি বর্তমান সমাজের 'উরফ' বা প্রথাকে বিবেচনায় নেন। ইমামদের যুগে যে প্রথা ছিল, তা বদলে গেলে তাখরীজও বদলে যায়।

উপসংহার (خاتمة): তাখরীজ কোনো মনগড়া ইজতেহাদ নয়। এটি হলো মাযহাবের সীমানার ভেতরে থেকে নতুন সমস্যার সমাধান দেওয়া। এর জন্য মুফতিকে অবশ্যই ইমামদের উসূল, মাসআলার ইল্লত এবং আরবি ভাষার ওপর গভীর পাণ্ডিত্য রাখতে হয়। এই পদ্ধতির কারণেই হানাফি ফিকহ হাজার বছর ধরে জীবন্ত ও কার্যকর রয়েছে।

প্রশ্ন-৫৭: ফতোয়া প্রদানে 'আল-ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ' (ফিকহী মূলনীতিসমূহ)-এর গুরুত্ব সম্পর্কে মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান-এর অভিমত উল্লেখ কর।

(اذكر رأي المفتي السيد محمد عميم الإحسان في أهمية "القواعد الفقهية" في الإفتاء.)

ভূমিকা (مقدمة): উপমহাদেশের প্রখ্যাত হানাফি ফকিহ ও মুহাদ্দিস মুফতি সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দেদী (রহ.) ফতোয়া ও ফিকহ শাস্ত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁর রচিত 'আদাবুল মুফতি' এবং 'কাওয়ায়িদুল ফিকহ' কিতাবগুলো মুফতিদের জন্য আকর গ্রন্থ। ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন মাসআলা মুখস্থ করার চেয়ে 'আল-ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ' (Legal Maxims) বা ফিকহী মূলনীতি আয়ত্ত করাকে তিনি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

ফিকহী মূলনীতি বা 'ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ'-এর পরিচয়: 'ক্বাওয়ায়েদ' শব্দটি 'কায়দা' এর বহুবচন, যার অর্থ ভিত্তি বা নিয়ম। ফিকহী কিতাবসমূহে এমন কিছু সংক্ষিপ্ত বাক্য বা সূত্র রয়েছে, যা হাজার হাজার আংশিক মাসআলার (Juz'iyyat) হুকুম অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন— "সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল" (আল-উমুরু বি-মাকাসিদিহা)।

মুফতী আমীমুল ইহসান-এর অভিমত ও গুরুত্ব: মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ.) তাঁর কিতাবে ফতোয়া প্রদানে কাওয়ায়িদের গুরুত্ব সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. হাজারো মাসআলার চাবিকাঠি: মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ.) মনে করেন, ফিকহের প্রতিটি মাসআলা আলাদাভাবে মুখস্থ রাখা মানুষের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু কেউ যদি ফিকহী কিতাবের মূলনীতি বা 'কাওয়ায়িদ'গুলো আয়ত্ত করে, তবে সে হাজার হাজার মাসআলার সমাধান খুব সহজেই বের করতে পারবে। তিনি বলেন, "কায়দা হলো এমন এক ভিত্তি, যার ওপর ফিকহের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা দণ্ডায়মান।"

২. মাসআলা উপস্থিত করার মাধ্যম (ইস্তিহজার): ফতোয়া লেখার সময় অনেক সময় মুফতির জেহেনে নির্দিষ্ট মাসআলাটি আসে না। মুফতি আমীমুল ইহসানের মতে, যদি মুফতির জানা থাকে যে— "কষ্ট সহজতাকে ডেকে আনে" (আল-

মাশাক্কাতু তাজলিবুত তায়সীর), তবে তিনি যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে শরিয়তের সহজীকরণের বিধানগুলো সহজেই স্মরণ করতে পারবেন এবং প্রয়োগ করতে পারবেন।

৩. নতুন সমস্যার সমাধান (নাওয়াজিল): আধুনিক যুগে নিত্যনতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে যার নাম পূর্ববর্তী কিতাবে নেই। মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ.)-এর মতে, এসব 'নাওয়াজিল'-এর হুকুম দেওয়ার জন্য 'কাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ' হলো আলোকবর্তিকা।

- **উদাহরণ:** আধুনিক ব্যবসায়িক ক্ষতি বা জরিমানার বিধান দিতে গিয়ে মুফতি "ক্ষতি দূর করতে হবে" (আদ-দারারু ইউযাল) এবং "ক্ষতি করাও যাবে না, সওয়াও যাবে না" (লা দরারা ওয়া লা দিরাবা) নীতিগুলো প্রয়োগ করতে পারেন।

৪. মাযহাবের সামঞ্জস্য বিধান (Dabt al-Madhhab): মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ.) উল্লেখ করেন যে, ফিকহী মূলনীতিগুলো মাযহাবের বিভিন্ন মাসআলার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখে এবং বিরোধপূর্ণ মাসআলার সমাধান দেয়। এর মাধ্যমে একজন মুফতি মাযহাবের 'ফিকহী মেজাজ' বুঝতে পারেন। তিনি তাঁর 'কাওয়ায়িদুল ফিকহ' গ্রন্থে শত শত কায়দা সংকলন করে দেখিয়েছেন কীভাবে হানাফি ফিকহ একটি সুশৃঙ্খল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

৫. ফতোয়ার দলীল হিসেবে ব্যবহার: ফতোয়া লেখার সময় কায়দা উল্লেখ করা উত্তরের সৌন্দর্য ও শক্তি বৃদ্ধি করে। মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ.) শিক্ষা দিয়েছেন যে, মুফতি যখন ফতোয়ার শেষে লিখবেন— "কারণ, মূলনীতি হলো: নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না", তখন প্রশ্নকারী ও আলেমসমাজ সেই ফতোয়াকে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করবেন।

উপসংহার (خاتمة): মুফতি সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রহ.)-এর মতে, একজন মুফতির জন্য 'কাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ' জানা কেবল জরুরিই নয়, বরং অপরিহার্য। এটি মুফতিকে মুখস্থনির্ভরতা থেকে বের করে প্রজ্ঞাবান বা 'ফকিহুন নাফস' হিসেবে গড়ে তোলে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি এই সত্যেরই সাক্ষ্য দেয় যে, উসুল ও কায়দা ছাড়া সঠিক ফতোয়া প্রদান অসম্ভব।

প্রশ্ন-৫৮: সাধারণ মানুষের প্রশ্ন (ইস্তিফাতুল আম্মাহ)-এর জন্য শরয়ী নীতিমালা কী?

(ما هي الضوابط الشرعية لـ"استفتاء العامة".)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামে জ্ঞানার্জন করা ফরজ। সাধারণ মানুষ (আম্মাহ), যারা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান বের করতে অক্ষম, তাদের দায়িত্ব হলো বিজ্ঞ আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জানো।" (সূরা নাহল: ৪৩)। একেই পরিভাষায় 'ইস্তিফতা' (ফতোয়া চাওয়া) বলা হয়। তবে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রেও শরিয়ত কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা বা 'দাওয়াবিত' নির্ধারণ করে দিয়েছে, যাতে ফতোয়া ও ইজতেহাদের পবিত্রতা রক্ষা পায়।

সাধারণ মানুষের ফতোয়া চাওয়ার শরয়ী নীতিমালা:

১. যোগ্য মুফতির শরণাপন্ন হওয়া (تحري المفتي المؤهل): সাধারণ মানুষের প্রথম দায়িত্ব হলো, যার-তার কাছে প্রশ্ন না করা। তাকে অবশ্যই এমন ব্যক্তির কাছে যেতে হবে যিনি 'আহলে ইলম' (জ্ঞানী) এবং 'আহলে তাকওয়া' (খোদাভীরু)।

- **নীতিমালা:** কেবল চটকদার লেবাস বা মিডিয়া ব্যক্তিত্ব দেখে ফতোয়া নেওয়া যাবে না। বরং যার ইলম ও আমলের খ্যাতি আছে, তাঁর কাছেই প্রশ্ন করতে হবে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, "এই ইলম হলো তোমার দ্বীন, সুতরাং কার কাছ থেকে দ্বীন নিচ্ছো তা দেখো।"

২. সত্য জানার উদ্দেশ্য থাকা (قصد الحق): প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হতে হবে আমল করা এবং আল্লাহর হুকুম জানা।

- **পরীক্ষা করা নিষেধ:** মুফতিকে পরীক্ষা করা, লা-জওয়াব করা বা তর্ক করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হারাম। একে 'তাআননুত' (হয়রানি) বলা হয়।
- **রুখসত বা ছাড় খোঁজা নিষেধ:** বিভিন্ন মুফতির কাছে ঘুরে ঘুরে নিজের মনমতো সহজ ফতোয়া খোঁজা (তাতাব্বু রোখাস) জায়েজ নেই। এটি প্রবৃত্তি পূজার শামিল।

৩. প্রশ্ন উপস্থাপনের শিষ্টাচার (আদাবুল ইস্তিফতা): প্রশ্নকারীকে অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে প্রশ্ন পেশ করতে হবে।

- **স্পষ্টতা:** প্রশ্নটি স্পষ্ট হতে হবে। ঘটনা যা ঘটেছে, ঠিক তা-ই বলতে হবে। কোনো তথ্য গোপন করা বা বাড়িয়ে বলা যাবে না। কারণ মুফতি তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই ফতোয়া দেবেন। ভুল তথ্যের কারণে ভুল ফতোয়া হলে তার দায়ভার প্রশ্নকারীর ওপর বর্তাবে।

- **কাল্পনিক প্রশ্ন বর্জন:** যে ঘটনা ঘটেনি বা ঘটার সম্ভাবনা নেই, এমন অবাস্তব ও কাল্পনিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা অনুচিত। সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ একে অপছন্দ করতেন।

৪. আমলযোগ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করা: অপ্রয়োজনীয় বিষয় (যেমন— জান্নাতে কি মোবাইল থাকবে?) বা তাত্ত্বিক বিষয় যা আলেমদের কাজ, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন করা উচিত নয়। তাদের প্রশ্ন হওয়া উচিত হালাল-হারাম, ইবাদত ও মুআমালাত সংক্রান্ত।

৫. মুফতির ফতোয়া মেনে নেওয়া (التسليم): যোগ্য মুফতি যখন দলীল বা মাযহাবের আলোকে ফতোয়া দেবেন, তখন তা মেনে নেওয়া সাধারণ মানুষের ওপর ওয়াজিব, যদি না তা স্পষ্টত কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী হয়।

- **নীতিমালা:** সাধারণ মানুষের কোনো মাযহাব নেই, মুফতির ফতোয়াই তার মাযহাব। সুতরাং মুফতি যা বলবেন, অন্তরে খটকা না থাকলে তা মানতে হবে।

৬. গোপনীয়তা রক্ষা করা: যদি প্রশ্নটি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক গোপনীয়তা সংক্রান্ত হয়, তবে নাম প্রকাশ না করে বা ইশারা-ঙ্গিতে প্রশ্ন করা উত্তম। মুফতিও উত্তর দেওয়ার সময় পরিচয় গোপন রাখবেন।

উপসংহার (خاتمة): 'ইস্তিফাতুল আম্মাহ' বা সাধারণ মানুষের প্রশ্ন করা হলো দ্বীন পালনের একটি মাধ্যম। এই প্রক্রিয়ায় প্রশ্নকারী ও মুফতি উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে। প্রশ্নকারীকে যেমন সৎ উদ্দেশ্যে ও সঠিক ব্যক্তির কাছে প্রশ্ন করতে হবে, তেমনি মুফতিকেও আল্লাহর ভয়ে সঠিক সমাধান দিতে হবে। এই নীতিমালার অনুসরণ সমাজকে বিভ্রান্তি ও ফিতনা থেকে রক্ষা করে।

প্রশ্ন-৫৯: মুফতী কর্তৃক হাদীসের পরিভাষা জানার ক্ষেত্রে মুজাদ্দিদী (মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান)-এর 'মীযানুল আখবার'-এর গুরুত্ব স্পষ্ট কর।
وضح أهمية "ميزان الأخبار" للمجددي في معرفة المصطلحات الحديثية (للمفتي.)

ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া প্রদানের অন্যতম প্রধান উৎস হলো আল-হাদীস। একজন মুফতির জন্য কেবল ফিকহী মাসআলা জানাই যথেষ্ট নয়, বরং সেই মাসআলার দলিল বা হাদীসের মান যাচাই করার যোগ্যতা থাকাও অপরিহার্য। উপমহাদেশের প্রখ্যাত হানাফি ফকিহ ও মুহাদ্দিস মুফতি সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দেদী (রহ.) ফতোয়া ও হাদিস শাস্ত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। মুফতিদের হাদিস শাস্ত্রীয় জ্ঞান ঝালাই করার জন্য তিনি **'মীযানুল আখবার'** (ميزان الأخبار) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উসুলুল ইফতা বা ফতোয়া শাস্ত্রের ছাত্রদের জন্য এই কিতাবটি একটি অপরিহার্য পাথেয়।

'মীযানুল আখবার'-এর পরিচয়: 'মীযান' অর্থ পাল্লা বা মানদণ্ড এবং 'আখবার' অর্থ সংবাদ বা হাদিস। অর্থাৎ এই কিতাবটি হলো হাদিস যাচাই-বাছাইয়ের মানদণ্ড। এটি মূলত 'উসুলুল হাদিস' বা হাদিসের মূলনীতি বিষয়ক একটি সারসংক্ষেপ গ্রন্থ, যা মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ.) হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা করেছেন।

মুফতির জন্য এই কিতাবের গুরুত্ব (أهمية الكتاب للمفتي):

১. দলিলের শক্তি যাচাই (معرفة قوة الدليل): ফতোয়া প্রদানের সময় মুফতিকে বিভিন্ন হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করতে হয়। 'মীযানুল আখবার' পাঠ করলে মুফতি জানতে পারেন কোন হাদিসটি 'সহিহ' (বিশুদ্ধ), কোনটি 'হাসান' (গ্রহণযোগ্য), আর কোনটি 'জয়িফ' (দুর্বল)। ফিকহী মাসআলায় প্রমাণের ক্ষেত্রে সব হাদিসের মান সমান নয়। এই কিতাবটি মুফতিকে হাদিসের স্তর বুঝতে সাহায্য করে, যাতে তিনি দুর্বল হাদিস দিয়ে শক্তিশালী মাসআলা প্রমাণ করার ভুল না করেন।

২. হানাফী উসুলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা (بيان أصول الحنفية): হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের কিছু নিজস্ব মূলনীতি আছে, যা শাফেয়ী বা মুহাদ্দিসদের সাধারণ নীতি থেকে ভিন্ন হতে পারে। যেমন— 'মুরসাল' হাদিস বা ফকিহ সাহাবীর বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা। মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ.) এই কিতাবে

হানাফি দৃষ্টিকোণ থেকে উসুলুল হাদিস বর্ণনা করেছেন। ফলে একজন হানাফি মুফতি সহজেই বুঝতে পারেন কেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কোনো নির্দিষ্ট হাদিস গ্রহণ করেছেন বা ছাড়েননি।

৩. পরিভাষার জ্ঞান (معرفة المصطلحات): ফিকহ ও ফতোয়ার কিতাবে প্রায়শই 'মুতাওয়াতির', 'মাশহুর', 'আহাদ', 'মুদাল' বা 'মাকলুব' ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। 'মীযানুল আখবার' গ্রন্থে এই পরিভাষাগুলোর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও জামে (Comprehensive) সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মুফতি যদি এই পরিভাষাগুলো না জানেন, তবে তিনি ফকিহদের বক্তব্য বা 'ইবারত' ভুল বুঝবেন।

- **উদাহরণ:** হানাফি মাযহাবে 'ফরজ' সাব্যস্ত হওয়ার জন্য 'মুতাওয়াতির' বা 'মাশহুর' হাদিস শর্ত। 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা কেবল 'ওয়াজিব' সাব্যস্ত হয়। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি 'মীযানুল আখবার' পড়লে পরিষ্কার হয়।

৪. জাল হাদিস থেকে সতর্কীকরণ (التحذير من الموضوعات): সমাজে প্রচলিত অনেক ভিত্তিহীন কথা হাদিস নামে চলে। মুফতির দায়িত্ব হলো মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করা। 'মীযানুল আখবার'-এ হাদিস গ্রহণ ও বর্জনের যে নীতিমালা শেখানো হয়েছে, তা মুফতিকে জাল হাদিস চিহ্নিত করতে এবং ফতোয়ায় তা ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে।

৫. ফিকহ ও হাদিসের সমন্বয় (الجمع بين الفقه والحديث): মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ.) ছিলেন একাধারে ফকিহ ও মুহাদ্দিস। তাঁর এই কিতাবটি ফিকহী মেজাজে লেখা। এটি মুফতিকে শেখায় কীভাবে হাদিসের সনদের (বর্ণনা সূত্র) পাশাপাশি মতন (মূল বক্তব্য) নিয়ে গবেষণা করতে হয়। একজন মুফতির জন্য 'রিওয়ায়াত' (বর্ণনা) ও 'দিরায়াত' (প্রজ্ঞা)—উভয়টিই জরুরি, যা এই কিতাবে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, একজন মুফতিকে 'মুফতি' হওয়ার আগে মুহাদ্দিস বা হাদিস বিশারদ হওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু হাদিসের নূন্যতম মূলনীতি জানা তাঁর জন্য ওয়াজিব। মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ.)-এর 'মীযানুল আখবার' সেই প্রয়োজনটিই পূরণ করে। এটি মুফতির হাতে এমন একটি পাল্লা তুলে দেয়, যার মাধ্যমে তিনি ফতোয়ার দলিলে ভেজাল ও খাঁটির পার্থক্য করতে পারেন।

প্রশ্ন-৬০: সমকালীন মুফতী কীভাবে শরীয়তের মূলনীতির (নস) আনুগত্য এবং বাস্তবতার প্রতি যত্নশীলতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন?

كيف يمكن للمفتي المعاصر أن يجمع بين الالتزام بالنصوص وبين مراعاة (الواقع؟)

ভূমিকা (مقدمة): বর্তমান যুগটি দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং জটিল। নিত্যনতুন সমস্যা বা 'নাওয়াজিল' মুফতিদের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমকালীন মুফতির প্রধান দায়িত্ব হলো দুটি মেরুর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা: একদিকে শরীয়তের অপরিবর্তনশীল নস (কুরআন ও সুন্নাহর বিধান), অন্যদিকে পরিবর্তনশীল কঠিন বাস্তবতা (ফিকহুল ওয়াকি)। এই দুয়ের মধ্যে সঠিক সমন্বয় বা 'তাতবিক' (Application) ছাড়া সঠিক ফতোয়া প্রদান সম্ভব নয়।

নস ও বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি:

১. নস বা মূলনীতির ওপর অবিচল থাকা (الثبات على النصوص): মুফতিকে সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে যে, শরিয়তের 'নস' বা স্পষ্ট বিধান (যেমন— সুদ, জিনা, মদ হারাম হওয়া) কেয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তনশীল। বাস্তবতার দোহাই দিয়ে হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করা যাবে না।

- **নীতিমালা:** "নস বা দলিলের বিপরীতে কোনো ইজতেহাদ চলে না" (লা ইজতেহাদা মা'আন নস)। মুফতি আধুনিকতার চাপে পড়ে মূলনীতি বিসর্জন দেবেন না।

২. বাস্তবতাকে গভীরভাবে অনুধাবন করা (فقه الواقع): ফতোয়া দেওয়ার আগে মুফতিকে অবশ্যই প্রশ্নকারীর পরিস্থিতি, দেশের আইন, সামাজিক প্রথা এবং যুগের চাহিদা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখতে হবে। একে 'ফিকহুল ওয়াকি' বলে। বাস্তবতা না বুঝে কেবল কিতাবের মাসআলা প্রয়োগ করলে ফতোয়া ভুল হতে পারে।

- **উদাহরণ:** ডিজিটাল কারেন্সি বা বিটকয়েন সম্পর্কে ফতোয়া দেওয়ার আগে মুফতিকে অর্থনীতি ও প্রযুক্তির বাস্তবতা বুঝতে হবে, কেবল প্রাচীন মুদ্রার কিতাবী সংজ্ঞা দিয়ে বিচার করলে চলবে না।

৩. উরফ ও প্রথার সঠিক ব্যবহার (اعتبار العرف): নস ও বাস্তবতার সমন্বয়ের অন্যতম মাধ্যম হলো 'উরফ' (Custom)। যেসব বিষয়ে শরিয়তের সরাসরি নিষেধাজ্ঞা নেই, সেখানে মুফতি যুগের প্রচলিত প্রথাকে মেনে নেবেন।

- **সমন্বয়:** প্রাচীন ফকিহগণ যে ফতোয়া তৎকালীন উরফের ওপর ভিত্তি করে দিয়েছিলেন, বর্তমান যুগের উরফ বদলে যাওয়ায় মুফতি সেই ফতোয়া পরিবর্তন করবেন। এটি নস-এর বিরোধিতা নয়, বরং নস-এর সঠিক প্রয়োগ। যেমন— বর্তমানে টাকার মান কমে যাওয়ায় মোহরানার পরিমাণ বাড়ানো।

৪. জরুরত ও হাজত-এর মূলনীতি প্রয়োগ (مراعاة الضرورة والحاجة): বাস্তব জীবনে মানুষ অনেক সময় বাধ্যবাধকতার (জরুরত) শিকার হয়। মুফতি শরিয়তের 'রুসখত' (সহজীকরণের বিধান) বা 'জরুরত'-এর মূলনীতি ব্যবহার করে কঠিন বাস্তবতায় নমনীয় ফতোয়া দেবেন।

- **সমন্বয়:** চিকিৎসা বা নিরাপত্তার প্রয়োজনে ছবি তোলা বা ভিডিও করার মতো বিষয়গুলোতে মুফতিরা 'হাজত'-এর কারণে ছাড় দিয়েছেন, যদিও মূলনীতিতে প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ। এখানে বাস্তবতা ও নস-এর উদ্দেশ্যের (মাকাসিদ) মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে।

৫. মাকাসিদুশ শরীয়াহ বা শরিয়তের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা: মুফতি দেখবেন যে, এই ফতোয়াটি দিলে শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য (ধর্ম, জীবন, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ রক্ষা) অর্জিত হচ্ছে কি না। যদি কিতাবী ফতোয়া প্রয়োগ করলে বাস্তবে বড় ক্ষতি (মাফসা দা) হয়, তবে মুফতি হেকমতের সাথে বিকল্প পথ খুঁজবেন।

৬. তাদরিজ বা পর্যায়ক্রমে সমাধান দেওয়া: সমকালীন অনেক সমস্যা (যেমন— সুদী ব্যাংক ব্যবস্থা) একদিনে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মুফতি বাস্তবতা মেনে নিয়ে মানুষকে ধাপে ধাপে বা পর্যায়ক্রমে সংশোধনের পথ দেখাবেন। সরাসরি সব হারাম বলে সমাজকে অচল করে দেবেন না, আবার হারামকে হালালও বলবেন না। বরং 'কম ক্ষতিকর' (আখাফফুদ দারারাইন) পথ বেছে নেবেন।

উপসংহার (خاتمة): একজন দক্ষ সমকালীন মুফতি হলেন তিনি, যিনি এক হাতে কুরআন-সুন্নাহ এবং অন্য হাতে যুগের পালস বা নাড়ি ধরে রাখেন। তিনি নস-কে বাস্তবতার ছাঁচে ফেলে এমনভাবে ফতোয়া তৈরি করেন, যা শরিয়তসম্মত এবং মানুষের পালনযোগ্য। এই প্রজ্ঞাপূর্ণ সমন্বয়ই হলো আধুনিক ফতোয়া শাস্ত্রের প্রাণ।